দাম ঃ পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

১৪ নভেম্বর - ২০১১, ২৭ কার্তিক - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

তাত্ত্বিক মাওবাদীদের মোকাবিলা করাই চ্যালেঞ্জ মমতার

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

ক্যানিং-এ আর এস এসের বিশাল সমাবেশ ; বিশ্বের মঙ্গলের
জন্যই সংগঠিত হিন্দু সমাজের প্রয়োজন : শ্রীভাগবত ❑ ৬

তাঁবেদার সাংবাদিক পুষতে তুঘলকি কৌশল সরকারের ❑ ৮

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছক কষেই ঘুঁটি সাজাচ্ছেন বিমান বসু ❑ ৯

মুদ্রিত গণ-মাধ্যমের যাদুকরী ক্ষমতা আর থাকছে না ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑ ১১

ভারতের নিরাপত্তা কীভাবে রক্ষিত হবে? ❑ অশোক কুমার মেহতা ❑ ১৩

খুনেদের চেয়েও বিপজ্জনক তাত্ত্বিক মাওবাদীদের মোকাবিলা
করাই চ্যালেঞ্জ মমতার ❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১৫

হার্মাদ না ভৈরব : নিরন্ন মানুষের কিছু আসে-যায় না ❑ অর্ণব নাগ ❑ ২১

আদি গ্রন্থ গ্রন্থসাহিব ❑ নির্মল কর ❑ ২৪

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাওয়া হেরিটেজগুলির
সংরক্ষণ প্রয়োজন ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৫

খোলা চিঠি : গরীব ঘরের শিশু, আবার বাঁচারও শখ! ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২৭

বিচ্ছেদ ও বিনাশ ❑ সরিতা রাঠোর ❑ ২৮

হাস্যোজ্জ্বল শিশুকন্যা কি কেবলই ছবি? ❑ প্রীতি বসু ❑ ২৯

কোচ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হোক ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩২

হিন্দুদের আবাদী জমির ওপর সূতিতে আলিগড় মুসলিম
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ❑ তরুণ কুমার পণ্ডিত ❑ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ সমাবেশ-সমাচার : ৩০

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মাওবাদীদের মোকাবিলা করাই চ্যালেঞ্জ মমতার — পৃঃ ১৫-১৬, ২১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২৭ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৪ নভেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

আবার দেশ বিভাজনের ষড়যন্ত্র

একবার ভারত বিভাজন করিয়াও মীরজাফরদের আশা মেটে নাই। তাহারা পুনরায় ভারত বিভাজন করিতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। নতুন এই কৌশলটির নাম 'প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১'। এই বিলটির মূল উদ্দেশ্য রহিয়াছে দেশটিকে ধীরে ধীরে তালিবান জঙ্গীদের হাতে তুলিয়া দিবার চিন্তা ভাবনা। ইতিমধ্যে যাঁহারা কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করিয়া পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিতে তৎপর তাহারাই এই বিলের রূপকার। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশানাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল নামে সংবিধান বহির্ভূত একটি ভুঁইফোড় কমিটি এই বিলটির খসড়া তৈরি করিয়াছে। এই কমিটিতে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে রহিয়াছে তিস্তা শীতলবাদ, জন দয়াল, হর্ষ মন্দারের মতো জাতীয়তাবাদী বিরোধী ব্যক্তিরা। যাঁহারা ইতিমধ্যেই জঙ্গী আফজল গুরু, কাসভ সহ দেশবিরোধী শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছেন। প্রচার হইতেছে বিলটির মূল উদ্দেশ্য নাকি সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু বিলটিতে রহিয়াছে অবিশ্বাস্য সব প্রস্তাব। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য হইল হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে প্রস্তাবিত বিলের ধারায় তাহার বিচার হইবে না। কেবলমাত্র মুসলমানরা আক্রান্ত হইলেই বিচার হইবে। এই আইন অনুসারে মুসলমানরা দাঙ্গা করিলে তাহাকে সাম্প্রদায়িক হিংসা বলা যাইবে না। মুসলমানরা হিন্দু সম্পত্তি লুঠ করিলে, হিন্দু মহিলাদের লুঠ করিয়া ধর্ষণ করিলে এই বিলে তাহাদের পুরস্কৃত করা হইবে কি না তাহা অবশ্য বলা হয় নাই, তবে হিন্দুরা এই লুঠের বিরোধিতা করিলে তাহারা দোষী হইবেন। এমনকী সিমি, আই এস আই প্রমুখ মুসলমান জেহাদী গোষ্ঠীর মতো ভয়াবহ কোনও সংগঠনও যদি দেশবিরোধী কোনও কথা বলেন, তবুও প্রকাশ্যে তাহার প্রতিবাদ করা যাইবে না। যদি কোনও হিন্দু ভারতবাসী লিখিত ভাবে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে ত্বদর্থে কোনও প্রতিবাদ করেন তবে তাহাকে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে উসকানি দিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে। কোনও সংখ্যালঘু মুসলমান ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার করিতে পারিবেন অথচ উত্তরপ্রদেশের ইমরানার শ্বশুর ইমরানাকে বলাৎকার করিলে কোনও হিন্দু তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবে না।

ভোটের লোভে মুসলমান তোষণের ফলে কাশ্মীর আজ হিন্দুশূন্য, অসম বিচ্ছিন্ন হইবার পথে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইতিমধ্যে আর পশ্চিমবঙ্গে থাকিবে কিনা সে প্রশ্ন উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবুও তোষণ বন্ধ হয় নাই। রাজ্যের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসিয়াই দশ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিয়াছেন অথচ ৬২০টি টোলের উন্নয়ন সম্বন্ধে নিশ্চুপ। কেবল মুসলমান তোষণ আসলে জঙ্গীদের তোষণ শুরু করিবার জন্যই এই বিলের প্রচেষ্টা। ইহার পর আগামীদিনে আফজল গুরু, কাসভকে ভারতরত্ন দিবার ঘোষণা ইউ পি এ সরকার করিলেও অবাক হইবার কিছু থাকিবে না। এই বিল বাস্তবায়িত হইলে সংখ্যালঘুদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইউ পি এ সরকার আগুন লইয়া খেলিতে উদ্যত হইয়াছে। হিংসা রোধের নামে পারস্পরিক বিভেদ ভাবনাকে উসকাইয়া দিতেছে। দেশকে বিভাজনের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এইসব কারণে গত বাদল অধিবেশনে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ইউ পি এ-র কিছু শরিক দল এই আইনের বিরোধিতা করিয়াছিল। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে আবার এই সর্বনাশা বিল সংসদে পেশ করা হইতেছে। তাই প্রত্যেক ভারতবাসীর অবিলম্বে এই বিলের প্রতিবাদ করা দরকার। প্রয়োজনে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইউ পি এ সরকারকে তাহাদের প্রস্তাবিত এই কালা আইনটিকে প্রত্যাহারে বাধ্য করিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কোনও একটি মতবাদ-ই মানব প্রগতির শেষ কথা এইরূপ চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। দর্শনের ছাত্র হিসাবে, আপনারা স্বীকার করিবেন যে, মানব প্রগতি রুদ্ধ হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই পৃথিবীতে নবতম মতবাদ জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্যই ভারতবর্ষে আমরা ওইসব পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলির ভাল অংশগুলি গ্রহণ করিয়া একটি সমন্বয়ী প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে ভাল অংশগুলির একটি তুলনা করিতে চাই। উভয় মতবাদকেই গণতন্ত্র বিরোধী ও এক নায়কত্বের দোষে অভিহিত করা হয়। উভয়েই ধনতন্ত্র বিরোধী। এইসব ঐক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে বিরোধ প্রচুর। ইউরোপ জাতীয় ঐক্য ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোর গলদ সম্পূর্ণ দুর করিতে পারে নাই।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ক্যানিং-এ আর এস এসের বিশাল সমাবেশ

বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই সংগঠিত হিন্দু সমাজের প্রয়োজন : শ্রীভাগবত

ক্যানিং থেকে ফিরে বাসুদেব পাল॥ 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে জানার জন্য একটু বেশি চেষ্টা করতে হয়। কেননা, এরকম কাজ সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এটা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। সর্বসাধারণ জনতা কোনও বিষয়কে অন্য সমান বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখতেই অভ্যস্ত। এরকম হলে ভুল-ত্রুটি হয়। অনেক সময় তুলনার অভাবে বিষয়টিকে সেই বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন আকাশের তুলনা আকাশই, সমুদ্র সমুদ্রের মতো, রাম-বারণের যুদ্ধও রাম-রাবণের যুদ্ধের মতোই। এরকম সঙ্ঘও সঙ্ঘের মতো— অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে সঙ্ঘের তুলনা চলে না। অন্ধকে পায়েস না খাইয়ে কেমন তা বোঝানো যায় না, তেমনি সঙ্ঘে না এলে সঙ্ঘকে বোঝা যায় না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গণবেশে (ইউনিফর্ম) থাকলেও সঙ্ঘ সৈনিক সংগঠন নয়। সঙ্ঘ দল নয়, সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত করতে চায়। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে এক আত্মীয়তার সুতোয় বেঁধে দেশের জন্য সুযোগ্য সমাজ হিসেবে দাঁড় করাতে চায়। এজন্য আমরা বলি সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে চায়। আমাদের দেশ মানে হিন্দুস্থান। পম্পরাগতভাবে হিন্দুরা এদেশে বসবাস করে আসছেন। প্রশ্ন হলো— সংগঠিত করতে চাইছি কেন? সংগঠিত হওয়াই সমাজের স্বভাব। সুস্থ থাকাই মানুষের স্বভাব। সমাজকেও সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থতা ছাড়া কাজ করা যায় না। মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র— এদের বিকাশের জন্য শক্তি চাই। লোকে বলে কথাবার্তা তো ভালো পিছনে শক্তি কতটা, এটাই বিবেচ্য। শক্তিশালী হলে অন্যের ভরসা ছাড়াই কাজ করা যায়'। উপরের বক্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের। তিনি গত ৬ নভেম্বর ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের এক বিশাল সমাবেশ তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। এদিন মঞ্চে তাঁর পাশে বসেছিলেন পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগ সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং সুন্দরবন জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালি।

তিনি আরও বলেন, বেঁচে থাকার জন্য রোজগার করার দরকার হয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য বাইরের ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়। কিছু করে সমাজের জন্য উপযোগী হতে হয়। এরকম কোনও দেশ বা রাষ্ট্রকে সজীব থাকার জন্য স্বাবলম্বী হয়েই চলতে হয়। বাইরের যাবতীয় আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। নিজে ঠিক থেকে অন্যের জন্য যোগ্য হতে হয়। এই তিনরকম কাজের জন্য যে শক্তির আবশ্যক তার যোগান সমাজের সংগঠন থেকে আসে। শ্রী ভাগবত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে বলেন— এখন আমাদের, আমাদের দেশ এবং সারা দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য সংগঠিত হিন্দু সমাজের প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে ভাষণরত সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

গত দেড় থেকে দু'হাজার বছরের মধ্যে রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। রাজা, মহারাজা, বাদশা-সুলতানদের রাজত্ব মানুষকে সুখ দিতে পারেনি। পরে পুঁজিবাদ এসেছে— তাও ব্যর্থ। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সাম্যবাদ এসেছিল। তাও ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে নব-পুঁজিবাদ চলছে। তা থেকে ভালো কিছু হয়নি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, লড়াই বন্ধ হয়নি। পরিবেশ দূষণ চলছেই। সঙ্কুচিত মনোভাব বাড়ছে। বাড়ছে একচেটিয়া আধিপত্যের মনোভাব। আমেরিকা, চীন দুনিয়াকে তাদের পদানত করতে চাইছে। পাকিস্তানে আমেরিকার দখলদারি বেড়ে চলেছে। চীন ভারতের সীমান্তে আস্ফালনরত। আমরা সব দেখে চলেছি। মানসিক ভেদাভেদ দূর করে সারা পৃথিবীকে নিজের করে নেবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন তা আর অন্য কোথাও নেই। আমরা একই বিশ্বসৃষ্টির অংশবিশেষ, তাকে জয় করা নয়, শোষণ নয়, তা থেকে পোষণ-পুষ্টি গ্রহণ করি। আমরা পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট—অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একথা মেনে নেবার মতো চিন্তাধারা সারা দুনিয়াতে নেই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের কাছেই আছে। অথচ সারা দুনিয়াই জীবনে সুখ-শান্তি চায়। এর ব্যবস্থা ভারতের ওই প্রাচীন হিন্দু চিন্তন-দর্শনের মধ্যে আছে। সবাই ওই আদর্শের কার্যকর স্বরূপ দেখতে চায়। সারা পৃথিবীরই এই হিন্দুত্বের প্রয়োজন। আমাদের দেশেও দরকার। ভারতও চারদিক থেকে সঙ্কটাপন্ন। ভিতরে বাইরে সঙ্কট। উত্তরে চীন, পশ্চিমে পাকিস্তান, ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা এবং সরকার— সকলেই চিন্তিত। দেশে নিয়মিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জাত-পাতের ভেদাভেদ, ব্যাপক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলছে। এর থেকে পরিত্রাণের

উপায় কি?

গরীবি বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সীমান্তে শত্রুর আস্ফালন, দেশের ভিতরে তাদের এজেন্টদের দাপাদাপি, স্বার্থভাব ভেদবুদ্ধি বাড়ছে। সবাই বলছেন— সমস্যা সমস্যা। তা বললে কি হবে? লোকে নিরাশ হয়। সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করে উপায় বের করতে হবে। যারা শুধু দেখে তাদের কাজ নেই, কাজ রয়েছে তাদের, যারা সক্রিয়। কেবল নিরাশ হয়ে, দর্শক হয়ে লাভ কি? প্রত্যক্ষ কাজ করতে হবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার জন্মজাত দেশভক্ত ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে স্কুলে দেওয়া মিষ্টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন, পড়াশোনায় সবসময় প্রথম দশজনের মধ্যে থেকেছেন। কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন 'অনুশীলন সমিতিতে' যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— 'আমৃত্যু ব্রহ্মচারী থেকে দেশের জন্য কাজ করব'। চাকরি করেননি, রোজগার করেননি। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা সে সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য যতরকম প্রয়াস চলছিল, তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে কাজ করেছেন। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে কাজ করেছেন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কাজ করেছেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে উগ্র জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার জন্য একবছর জেল খেটেছেন। বিচারকের বক্তব্য ছিল— তাঁর ভাষণের থেকেও উনি আত্মপক্ষ সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আরও উগ্র।

ডাক্তারজী দেখলেন—মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশে কী করে রাজত্ব করছে? দখল করল কিভাবে। সবাই জানেন ইংরেজরা একদিন চলে যাবে। কেউ ভাবছেন না ইংরেজরা যাওয়ার পর কী হবে! যে কাজ কেউ করছে না, সেই কাজ তিনি শুরু করলেন, সমাজে যে দোষ আছে তা দূর করার কাজ তিনি করবেন। যে কাজের ফলে সব দোষ দূর হয়ে দেশের ভাগ্যসূর্য উদিত হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই প্রচেষ্টার সুফল।

এদেশের হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হবে, ভারতের ভাগ্য কাদের হাতে? এদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ যা করবে তাই হবে। হিন্দুসমাজকে দেশের ভালো করার জন্য গুণসম্পন্ন হতে হবে। ভেদাভেদ ভুলে এক হতে হবে। হিন্দুত্ব সবাইকে সংগঠিত করতে পারে। 'হিন্দু' কোনও পূজা-পদ্ধতির নাম নয়। হিন্দু হওয়ার জন্য কাউকে নিজের উপাসনা পদ্ধতি ত্যাগ করার দরকার নেই। অনেক দেব-দেবী, বহু ভাষা, বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়াতে অসুবিধা নেই। সব বিবিধতাকে সমান সম্মানের সঙ্গে মেনে নিয়ে ভেদাভেদ, স্বার্থ, দলাদলির উপরে উঠতে হবে। যে কোনও দল করে 'হিন্দু' হতে পারে। বিবিধতার মধ্যে একতার দর্শনই হিন্দুত্ব। ভারতের বাইরের দেশ সব কট্টরপন্থী। তারা বলে তাদেরটাই ঠিক, অন্যেরটা ভুল। আমাদের পরম্পরা বলে, 'আমাদের দৃষ্টিতে আমরা ঠিক, তোমাদের দৃষ্টিতে তোমরা ঠিক, নিজের নিজের পথে চলে মিলেমিশে থাকবে, তাহলেই জীবনের ধারণা (ধরে রাখা) হবে। 'ধর্ম' হলো তা যা জীবনকে ধরে রাখে। এদেশে ধর্মের পরিভাষায় দেব-দেবী, পূজা-পদ্ধতির উল্লেখ নেই। হিন্দীতে বলা হয়—যা কি রহী ভাবনা যৈসী, প্রভুমূরত দেখ তিন তৈসী, পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। পূজা যে কারও কর, কিন্তু পরোপকার কর, অন্যকে কষ্ট দিও না। মিলেমিশে থাক। উপভোগ নয় সংযম। পরোপকারের জন্য ত্যাগময় জীবন। সকলের মিলিত দানেই জীবন। কাপড় একজনের তৈরি নয়। কৃষক তুলো উৎপাদন করে। কাপড় অন্যত্র তৈরি হয়। জীবনটাই অপরের দেওয়া, তা ফেরৎ দিতে হবে।

সর্দার প্যাটেলের মতে গান্ধী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘ জড়িত নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল নেহেরুকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) কোনও ষড়যন্ত্র বা হাত ছিল না এবং নেহেরু প্যাটেলের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। সর্দার প্যাটেলের কথা ছিল, হিন্দু মহাসভার একটি গোষ্ঠী ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। এবং হিন্দু মহাসভাকে প্যাটেল অনেক বেশি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার পর নেহেরু এবং প্যাটেল উভয়েই আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। যদিও সকলেই জানেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জহরলাল নেহরু অনেক বিষয়েই ভিন্নমত পোষণ করতেন। প্যাটেল তাঁর দপ্তরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নাক গলানোয় দারুণ মনঃক্ষুণ্ণ হতেন।

অতি সম্প্রতি 'ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট' তিন খণ্ডে নেহেরু-প্যাটেল, গান্ধীজী- প্যাটেল এবং গান্ধীজী-নেহেরু অপ্রকাশিত পত্রাবলী প্রকাশ করেছে। এসব চিঠি চালাচালি হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এবং স্বাধীনতা পাওয়ার অব্যবহিত পরে। ওই তিন খণ্ডে প্রকাশিত পত্রাবলী আগে কখনও বের হয়নি।

আদর্শ অনুসারী জীবন-যাপনকারী হলো 'হিন্দু'। এই চিন্তাধারা ভারতভূমিতে পরিপুষ্ট হয়েছে। ভারতকে যারা মা বলে মানে তারাই হিন্দু। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, হিমালয় থেকে সাগর, সুজলা-সুফলা-মলয়জ-শীতল ভূমি। এরই প্রদত্ত স্বভাব বিবিধতার মধ্যে একতা। এ চৈতন্যময়ী মাতৃভূমি কেবল জমি নয়। কারও সম্পত্তি নয় যে, যাকে খুশী দিয়ে দেব। এর টুকরো করা যায় না, মনে হলো তাই বিক্রি করে দিলাম, ভাড়া দিলাম— হয় না। এই চৈতন্যময়ী মাতৃত্বের মনোভাব যাদের আছে তারাই হিন্দু। আমাদের পূর্বপুরুষরা তারই অনুশীলন করেছেন, বিবিধতার মধ্যে একতা এবং ভারতভক্তি। কতো না নাম রয়েছে। সব নাম বলতেই কয়েকদিন লেগে যাবে। আধুনিককালেও দক্ষিণবঙ্গেই কতজন রয়েছেন— স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র। এঁরা নিজেদের জীবনে দেশভক্তি, সংস্কৃতি ও স্বাভিমানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দেশের জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করেছেন। এই পূর্বপুরুষদের গৌরবের কথা মনে রেখে তাঁদের আদর্শ হিসেবে যাঁরা মনে করেন তারাই হিন্দু। ওই আদর্শ অনুসরণ করে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে আপন মনে করে ভারতের পরমবৈভবের জন্য প্রয়াস করা, গুণসম্পন্ন হওয়া। এটাই সংগঠন, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকেই এই ভিত্তিতে সংগঠিত করা। সঙ্ঘ হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে চায় না। সবাইকে যুক্ত করতে চায়, এমনকী, আজকের সঙ্ঘ বিরোধীদেরও। ভারতে বসবাসকারীরা ভারতমাতার পুত্র। একই পূর্বপুরুষ ও পরম্পরার অনুগামী। আমাদের সবার রাষ্ট্রীয়তা 'হিন্দু'। এটাই সবাই মেনে চলুন। দেশ ও সংস্কৃতি সবার উপরে। রোজই ছোট ছোট অভ্যাস করা, পরস্পর সৌহার্দ্য-সুসম্পর্ক, পরোপকারের মনোভাব। এই হিসেবে সমাজকে সংগঠিত করা সঙ্ঘের কাজ। এটাই ভারত ও বিশ্বের সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজন। সবাই সুখী না হলে ভারত সুখী হবে না। এই দেশ ও দুনিয়াতেই থাকতে হবে। আজকে এখানে সমবেত সকলে সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে যুক্ত হোন। মায়েদের জন্য রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। ভারতবর্ষকে জগতগুরুর আসনে বসাতে হবে— এই লক্ষ্যে সকলে সংযুক্ত হোন।

এদিন সুন্দরবন জেলার ১২৪ শাখার দু'হাজারের বেশি স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গণবেশে ক্যানিং-এ একত্রিত হয়েছিলেন। দশ হাজারের মতো সর্বসাধারণ নাগরিক ও উপস্থিত হয়েছিলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনজীর ভাষণ শুনতে। মায়েদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। জেলা কার্যবাহ স্বপন সাহা মঞ্চে উপবিষ্ট সঙ্ঘচালকদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রবেশপথে লালপাড় সাদাশাড়ি পরিহিতা মা-বোনেরা সরসঙ্ঘচালকজীর কনভয়ের উপর পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানান। সব মিলিয়ে এক সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থিত সমাবেশ। শেষে ধন্যবাদ জানান দীপক নস্কর।

তাঁবেদার সাংবাদিক পুষতে তুঘলকি কৌশল সরকারের

গূঢ়পুরুষের

কলম

সম্প্রতি রাজ্য তথা দফতর নির্দেশ (আই সি এ ২৩০০ (৬)/২০১১) জারি করেছে যে ১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ থেকে কলকাতার সমস্ত কর্মরত সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র বাতিল করা হচ্ছে। সরকারি পরিচয়পত্র পেতে ইচ্ছুক সাংবাদিকদের চলতি নভেম্বর মাসের ২১ তারিখের মধ্যে তথ্য অধিকর্তার কাছে নতুনভাবে আবেদন জানাতে হবে। উদ্দেশ্য, যাঁরা স্তাবকতা করবেন না বলে জেদ ধরেছেন তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহাকরণের সরকারি পরিচয়পত্রধারী সাংবাদিকদের সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ততর হচ্ছে। কিন্তু খবরের কাগজে অথবা টিভি চ্যানেলের খবরে তা লেখা বা দেখানো হচ্ছে না। তাই রাজ্যের সাধারণ মানুষ জানেন না যে মহাকরণে সাংবাদিকদের গতিবিধি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখন কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত। মহাকরণের দোতলায় যেখানে মুখ্যমন্ত্রীসহ পদস্থ আমলারা বসেন সেখানে আগাম অনুমতি ছাড়া সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই ভি ভি আই পি এলাকায় একদা সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট 'প্রেস কর্নার' ছিল। বামফ্রন্টের আমলে ১৯৯২ সালের ৭ জানুয়ারি তৎকালীন তথ্য ও পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গড়া সেই ঐতিহাসিক প্রেস কর্নারটি ভেঙে দেওয়া হয়। বুদ্ধদেববাবুর অভিযোগ ছিল, সাংবাদিকরা প্রেস কর্নারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে সেদিন মহাকরণে হাঙ্গামা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। হ্যাঁ, একথা সত্যি যে ওইদিন মমতা মহাকরণে এসেছিলেন জ্যোতিবাবুর কাছে একটি বোবা হতদরিদ্র ধর্ষিতা মেয়ের হয়ে বিচার চাইতে। একথাও সত্যি যে দুপুরের ভাতঘুম দিয়ে সল্টলেকের ইন্দিরা ভবন থেকে মহাকরণে ফিরতে জ্যোতিবাবুর দেরি দেখে সেদিন মমতা কিছুক্ষণ প্রেস কর্নারে বসেছিলেন। সাংবাদিকরাই তাঁকে প্রেস কর্নারে জ্যোতিবাবুর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন। মমতা তখন ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং যুব কংগ্রেস নেত্রী। তবু রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ করেননি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মমতাকে তাই সাংবাদিকরাই প্রেস কর্নারে বসার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। সেই অপরাধে ক্ষিপ্ত বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশে চিরতরে প্রেস কর্নারটি সরিয়ে দেওয়া হয়। বহু মাস পরে সাংবাদিকদের লাগাতার চাপে বুদ্ধদেববাবু বাধ্য হন ভেঙে দেওয়া প্রেস কর্নারের স্থানে, টিভি চ্যানেলের চিত্রগ্রাহক ও অন্যান্য সাংবাদিকদের জন্য একটি ছোট্ট 'পোডিয়াম' গড়ে দিতে। সেখানে চিত্রগ্রাহকদের ক্যামেরা বসাতে অসুবিধা হবে না। টিভির পর্দায় মহাকরণে মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তখন এই বিশেষ পোডিয়ামটি দেখা যায়। একটু ভুল হলো। এতকাল দেখা যেত। এখন দেখা যায় না। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পোডিয়ামটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই মমতা অতীতে একাধিকবার বলেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তিনি পুরানো স্থানেই প্রেস কর্নার আবার গড়ে দেবেন। মমতা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। উল্টে সেই পুরানো প্রেস কর্নারের স্থানে সাংবাদিকদের জন্য যে পোডিয়ামটি ছিল সেটি হঠিয়ে দিয়েছেন। মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনটি মেটাল ডিটেক্টার বসানো হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে কলকাতার সাংবাদিকদের একাংশের সঙ্গে মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তার সুযোগ নিয়ে মাওবাদী ঘাতক স্কোয়াড হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাতে পারে। তাই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবদের যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। শুধু সাংবাদিকদেরই নয়, আগাম অনুমতি ছাড়া বহিরাগত সকলেরই এই বিশেষ জোনে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবিকল এই যুক্তিই বুদ্ধদেববাবুরা ১৯৯২ সালে দেখিয়ে ছিলেন। বলা হয়েছিল, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাওয়া জ্যোতি বসুকে রক্ষা করতেই 'প্রেস কর্নার' ভি ভি আই পি জোন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা বহুল প্রচলিত কথা আছে, যে লঙ্কার সিংহাসনে (পড়ুন মহাকরণে ক্ষমতায়) বসে সেই পরে রাবণ হয়। কারণ, শাসন ক্ষমতায় বসা ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যর্থতার সমালোচনা পছন্দ করেন না। তাঁরা চান সাংবাদিকরা স্তাবকতা করুন। সাংবাদিকরা ক্ষমতাধরদের সাফল্যের খতিয়ানই নানাভাবে নানা ছলে জনগণের কাছে দিবারাত্র তুলে ধরুন। ক্ষমতাধরদের 'ইমেজ' আকাশছোঁয়া হোক। জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেববাবুরা অতীতে তাই চেয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখনও তাই চাইছেন। সামান্য কয়েকজন বেয়াড়া সাংবাদিক বুদ্ধদেববাবুদের কথা সেদিন শোনেননি। মমতার কথাও আজ শুনছেন না। তাঁরা কালো ইস্কাপনের বিবিকে লাল হরতনের বিবি বলতে নারাজ। তাই মমতা বলেছেন, কলকাতার সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচুর বেনোজল ঢুকছে। এই বেনো জল বার করতেই সম্প্রতি রাজ্য তথা দফতর নির্দেশ (আই সি এ ২৩০০ (৬)/২০১১) জারি করেছে যে ১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ থেকে কলকাতার সমস্ত কর্মরত সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র বাতিল করা হচ্ছে। সরকারি পরিচয়পত্র পেতে ইচ্ছুক সাংবাদিকদের চলতি নভেম্বর মাসের ২১ তারিখের মধ্যে তথ্য অধিকর্তার কাছে নতুনভাবে আবেদন জানাতে হবে। উদ্দেশ্য, যাঁরা স্তাবকতা করবেন না বলে জেদ ধরেছেন তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র ১২ মাস অন্তর নবীকরণ করা হয়। সুতরাং কলকাতার সমস্ত সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র এক লপ্তে বাতিল না করে নবীকরণের সময় 'আমরা-ওরা' নীতিতে ঝাড়াই বাছাই করা যেতে পারতো। কথাটা বলতে হচ্ছে কারণ মমতার স্তাবক সাংবাদিকদের এবং বামপন্থী সাংবাদিকদের একই ব্র্যাকেটে ফেলে দেওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন মমতাপন্থীরা। মুড়ি-মিছরির দর বাজারে এক নয়। দুঃখ পাওয়ারই কথা!

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছক কষেই ঘুঁটি সাজাচ্ছেন বিমান বসু

নিশাকর সোম

সাম্প্রতিককালে রাজ্যের দুই শিবিরে চলেছে ছক কষে এগোবার প্রচেষ্টা। আদতে নেতৃত্বে থাকার জন্য ঘুঁটি সাজানো। এজন্য সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু সদ্য-সমাপ্ত দু'দিনের রাজ্য-কমিটির সভায় সাংগঠনিক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে নিজের নেতৃত্বকে বজায় রাখার জন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। বর্ধমান লবিকে চুরমার করতে বর্ধমান জেলা-কমিটির সম্পাদক অমল হালদারকে 'কোল মাফিয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা'-এর অভিযোগে জেলা- সম্পাদকের পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্মর্তব্য, ইতিমধ্যেই বর্ধমানের দুই নেতা বিনয় কোঙার এবং নিরুপম সেনও কোণঠাসা হয়ে গেছেন। বর্ধমানের আরেক নেতা মদন ঘোষ যেদিকে হাওয়া ভারি, সেদিকেই থাকবেন। বিমানবাবু মদন ঘোষকে তাঁর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরিকল্পনামতো পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য-কমিটির সভায় সমালোচনা উপস্থিত করানোর ব্যাপারে বিমান বসু সফল। এছাড়া বিমান-বিরোধী তরুণ রায়কেও কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিমান বসু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রকে টেনে নিয়েছেন। সূর্যবাবু বরাবরই দীপক সরকার অ্যান্ড কোং-এর বিরোধী। মেদিনীপুরের নেতা ডহরেশ্বর সেন-কে বিমান বসু আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছেন। ডহরেশ্বর সেন প্রাক্তন ছাত্র-নেতা হিসাবে বিমান বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

রাজ্য-কমিটি প্রায় দশটি জেলার সম্পাদক পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে। বিমান-বিরোধী জেলা-সম্পাদকদের কপাল পুড়ছে। বিমান বসু ঠিক প্রমোদ দাশগুপ্তের কায়দায় এগোচ্ছেন এবং পার্টি কংগ্রেসে শেষমেশ নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে সংখ্যাধিক্যের দলেই ভিড়বেন। সদ্য সমাপ্ত সিপিএম-রাজ্য- কমিটির সভায় প্রায় সকল সদস্যই বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-গৌতমের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট তৈরি করছেন বিমান-বুদ্ধ- গৌতম। এই ত্রয়ী নেতৃত্বে থাকলে পার্টির সাধারণ কর্মীরা উৎসাহিত হবে না।

এরই বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূলের সরকারের সামনে অনেক 'সঙ্কট' উপস্থিত হয়েছে। প্রথমেই বলতে হয় পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি। তৃণমূলের সাংসদদের সভায় একটি কৌশলী প্রস্তাব নিয়ে বলা হচ্ছে, প্রয়োজনে ইউ পি এ সরকার পরিত্যাগ করে তৃণমূল চলে আসবে। বাজারী সাংবাদিকরা রটাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বিজেপি নেতা আদবানীজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সন হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেকের দিন তিনি বলেছেন— ''যদি চারটি রাজ্যে সরকার চালিয়ে অল ইন্ডিয়া পার্টি হয় তবে আমিও দেখিয়ে দেব ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর এবং আন্দামানে আমাদের শক্তি কতটা।'' কটাক্ষ

কংগ্রেস-কে। এই সভাতেই শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''জনসাধারণ চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হোন!'' তৃণমূল পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'একলা চলো রে' নীতি প্রয়োগ করতে চলেছে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত নন— কাজেই তিনি পঞ্চায়েত-এর ক্ষমতা বিডিওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের মনিটরিং-এর অধীনে রাখছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত রাজের নীতি মিলতে পারে না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে তৃণমূলের দু'জন বিধায়ক মাওবাদী। এদিকে মধ্যস্থতাকারীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে মমতা বলেছেন— ''যৌথবাহিনীর অ্যাকশন চলবে। কলকাতায় যাঁরা মাওবাদীদের মদত দিচ্ছেন তাঁদেরও ছাড়া হবে না।'' ঠিক বুদ্ধদেববাবুর কণ্ঠস্বর। তখন কিন্তু মমতা দেবী বলেছিলেন ''একজন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে কিছু করা হলে আগুন জ্বলবে।''

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাতে এক গুরুতর সঙ্কট শিশুমৃত্যু, অ্যাসিড প্রয়োগ, চিকুনগুনিয়া, সর্বশেষ হাসপাতালে মদ্যপ চিকিৎসক। কিছু সরকারি চিকিৎসক ভি আর এস নিতে চাইছেন। নার্সরাও আন্দোলন করতে চলেছেন। পরিবহণের বেতন বন্ধে তৃণমূলী পরিবহণ কর্মীরা আন্দোলনমুখী হচ্ছেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে— তাতে অধ্যাপক-ছাত্র বিদগ্ধজনদের আন্দোলনের পথ খুলে দেওয়া হলো নাকি?

নয়াচরে বুদ্ধবাবুর ছেঁড়া জুতোয় পা-গলালেন তৃণমূল সরকার। প্রসূন মুখার্জির হাতে নয়াচর তুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসূনবাবুই ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে এনেছিলেন। বুদ্ধবাবুরা গদগদ হয়েছিলেন। আজ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে— শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেছেন— ''নয়াচরের চুক্তি প্রকাশ্যে বলা হবে না।'' সিঙ্গুর চুক্তি সম্পর্কে তো বুদ্ধদেববাবুও এই কথা বলেছিলেন! ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস!

পাটচাষী, আলুচাষীরাও বিরুদ্ধে গেছেন। এরা সারের দাম কমানোর দাবি করছেন। রাজ্য-সরকার পারবেন কি? প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন, ''পেট্রোপণ্যেকে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।''

এ-রাজ্যে কংগ্রেসও একলা চলার নীতি নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাইছে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা তথা তৃণমূলকে তোষামোদ করতে বাধ্য হবে।

ধর্মের ষাঁড় হত্যা

মালদা জেলার রতুয়া ১নং ব্লকে গত ১৬ অক্টোবর গণস্বাক্ষর করা ১০৮ জনের একটি অভিযোগ বি ডি ও পার্থ দে এবং থানার ও সি সঞ্জয় ঘোষকে হিন্দুরা জমা দেয়। অভিযোগ-পত্রে শিবের নামে ছাড়া ষাঁড়কে খেয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। অভিযোগকারীরা বলেন দেবতার নামে ছাড়া ষাঁড় কোনও ফসলের ক্ষতি করলে তার বিচার আছে। কিন্তু সেটি বিক্রি করা যায় না। কংগ্রেসের অঞ্চল প্রধান মামলত আলি বলেছেন, ষাঁড়টি ধান ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে এবং সেটি বিক্রি করা হয়েছে। হিন্দুদের বক্তব্য বিক্রি করা হলে তার ছাড়পত্র থাকবে। কিন্তু কোনও ছাড়পত্র অঞ্চলপ্রধান দেখাতে পারছেন না। ফলে প্রধান গিয়েছেন ফেঁসে। হিন্দুরা মনে করছেন ষাঁড়টিকে মেরে কেটে ভক্ষণ করা হয়েছে। কাশী কর্মকার, বিজন মিত্র ও নবকৃষ্ণ মণ্ডলরা প্রধানের শাস্তি চেয়েছে। একটি চাপা উত্তেজনা সেই অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে। আর এস পি বিধায়ক রহিম বক্সী এবং তৃণমূল নেতা শম্ভু চৌধুরী উভয়েই এই ঘটনা যদি সত্যি হলে প্রধানের শাস্তি চেয়েছেন। এখন পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। প্রশাসন এই ঘটনার যথাযথ বিচার করবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। হিন্দুরা দেবতাদের নামে ছাড়া ষাঁড়কে এই ভাবে অদৃশ্য হতে দেখে এলাকাবাসী ক্ষোভ ফেটে পড়েছেন এবং এর সুবিচার না পেলে পরবর্তীতে আন্দোলনে সামিল হবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

শয়তানের নাম পাকিস্তান

গত ৩ নভেম্বর প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন করে পাকিস্তানের তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী ফিরদৌস আওয়ান জানিয়েছিলেন যে তাঁরা (পাকিস্তান) মন্ত্রিসভার বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতের 'সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে'র (মোস্ট ফেভারড নেশনস বা এম এফ এন) মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমর্থন করা হবে। ১৯৯৬ সালে ভারত যখন পাকিস্তানের এম এফ এন মর্যাদা'র পাওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছিল, তখন ভারতও আশা করেছিল পাকিস্তানও এব্যাপারে তাদের অনুমোদন দেবেন। কিন্তু আশার ছলনে ভুলে গত দেড় দশকে সেই আশা যখন নিরাশার দুলুনিতে হতাশায় পর্যবসিত হতে চলেছে ঠিক সেই সময়-ই ফিরদৌসের এহেন ঘোষণা নেহাত-ই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য তার দিন-তিনেকের মধ্যে পাক-প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী-র মন্তব্য বিস্ময়ের জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে ভারতকে নামিয়ে দিয়েছে। গিলানী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এব্যাপারে পাকিস্তান ভারত-কে সমর্থন করবে না কোনওমতেই। কূটনীতিকদের কানাকানি— যাঁরা ৩ নভেম্বর পাক সংস্কৃতি মন্ত্রী-র ঘোষণা শুনে পাক-সহৃদয়তায় হা-হাসান, হা-হুসেন

করছিলেন, তাঁরা পাকিস্তানকে না চেনার দায়ে এখনও মাতৃগর্ভে!

ফিরিয়ে নেবার অধিকার

রাইট টু রিকল (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার) দেশের স্থিতাবস্থাকে বিপন্ন করবে বলেই মনে করছেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। প্রসঙ্গত, আন্না হাজারের টিম দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের যে দাবি করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম হলো রাইট টু রিকল। অর্থাৎ কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি-র কাজে সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী অসন্তুষ্ট হলে পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই তাঁরা ওই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে পুনরায় নির্বাচনের রাস্তায় যেতে পারেন। জনচেতনা যাত্রা উপলক্ষে গত ৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লালকৃষ্ণ আদবানী মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এস ওয়াই কুরেশি-কে এব্যাপারে সমর্থন করে ওই মন্তব্য করেন। তবে তিনি সেইসঙ্গে এও মেনে নেন— ''কালো টাকার ইস্যু এবং নির্বাচন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই আমার বিশ্বাস। যদি আপনি দেশ থেকে দুর্নীতিকে দূর করতে চান তবে নির্বাচনী-সংস্কার অবশ্যকর্তব্য।''

দলাই লামার বিরুদ্ধে

সুযোগ বুঝে দলাই লামার বিরুদ্ধে সুর চড়াল চীন। চীনের সংবাদমাধ্যম বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আত্মাহুতি দেওয়ার ব্যাপারে মদত দেওয়ার জন্য দলাই লামা-কে সরাসরিই অভিযুক্ত করেছে। চীনা সংবাদমাধ্যমের বক্তব্য, ''স্বাধীন তিব্বতে'র দাবিকে উস্কে দিয়ে দলাই লামার সমর্থকরা আত্মাহুতি দিয়ে দাবিটি-কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে।'' নির্লজ্জের মতো এই 'আত্মাহুতি'কে 'নাটক' আখ্যা দিয়ে চীনের সরকারি কাগজ 'গ্লোবাল টাইমস' বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন ছেপেছে—'আত্মাহুতি-র নাটক দেখিয়ে দিল দলাই লামার উস্কানি'। কাগজটি-তে আরও লেখা হয়েছে, ''সমস্ত ভুক্তভোগী (ন'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দু'জন সন্ন্যাসিনী যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন) দলাই লামার বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের মাধ্যমে প্রলুব্ধ হয়েছিল।'' স্বাধীন তিব্বতের চিন্তা! তার জন্য আত্মাহুতি! বিশ্বের দৃষ্টিকে আড়াল করতে আর নিজেদের মহাপাপ-কে ঢাকতে চীনের যত দোষ, নন্দ ঘোষ আপাতত দলাই লামা-ই।

হাত বাড়ালেই পরমাণু অস্ত্র

হাত বাড়ালেই আপনি পেয়ে যাবেন পরমাণু অস্ত্র। তবে তার জন্য আপনার পাসপোর্ট লাগবে। পাকিস্তানে যেতে হবে তো! মার্কিন গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানে এমন চমৎকার (ভয়ংকর এবং বীভৎসও বটে) তথ্য উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় নিরাপত্তাহীন বা কোনও ক্ষেত্রে সামান্য নিরাপত্তাযুক্ত ভ্যানে নিউক্লিয়ার অস্ত্র-সামগ্রী ঘিঞ্জি, জনবহুলও প্রভূত যান সমাগমের রাস্তা দিয়ে অবলীলায় গন্তব্যে চলেছে। আঁতকে ওঠা মার্কিন গোয়েন্দারা এখনও মন দিয়ে অনুসন্ধানে ব্যস্ত— এই বীভৎস পরিস্থিতি'র সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরা তার ফায়দা এখনও অবধি কতটা লুটতে পেরেছে। অবশ্য মার্কিন কূটনীতিকদেরকে অনেকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন— পাকিস্তানের বন্ধুকৃত্য (বন্ধু মানে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা) দেখে অত আঁতকে ওঠার কি আছে!

মুদ্রিত গণ-মাধ্যমের যাদুকরী ক্ষমতা আর থাকছে না

রমাপ্রসাদ দত্ত

খবরের কাগজ এখন টেলিভিশনকে অনুকরণ করছে। যে টেলিভিশনকে অনেক কারণে 'ইডিয়ট বক্স' বলা হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে মুদ্রিত গণমাধ্যম কেন হাঁটা শুরু করল একই পথে? পাঠকদের রুচি ও চাহিদা বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তন? না, টেলিভিশনের রীতিনীতিকেই আদর্শ ভাবছেন প্রিন্ট মিডিয়ার লোকজন? আসলে সবটাই নির্ভর করছে বাণিজ্যিক অস্তিত্বের লড়াইয়ের উপর। লক্ষ্য ক্রেতা। তাঁদের মনপসন্দ জিনিস পরিবেশন করতে না পারলে বাণিজ্যিক দিক থেকে পিছু হঠতে হবে। টেলিভিশন এসময় শক্তিশালী গণমাধ্যম। তা ঢুকে পড়েছে ঘরে ঘরে। সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে মনোরঞ্জনী ক্ষমতা নিয়ে। সেই ক্ষমতা মুদ্রিত গণমাধ্যমের নেই। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম দর্শক-শ্রোতার কাছে বিনোদন সামগ্রী সহজে পৌঁছে দিতে পারছে। চোখ কান থাকলেই দেখা শোনা যায়। পড়ার কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের কাছে কাগজের কোনও দাম নেই। যাঁরা স্বল্প লেখাপড়া জানেন তাঁরাও গুরুত্ব দেন না কাগজকে। লেখাপড়া জানা মানুষদের মধ্যে কতজন নিয়মিত কাগজ পড়েন? পড়লেও ক্রেতা কজন? অথচ একটু অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায়, টেলিভিশন প্রকৃত অর্থেই সর্বত্রগামী হয়ে মন অধিকার করেছে। খবরের কাগজ দূরে থেকেছে। যাঁরা খবরের কাগজের ক্রেতা তাঁরাও অনেকে বলছেন, আগে বাড়িতে কাগজ এলে প্রায় সকলেই একটু-আধটু পড়ত। এখন কাগজ পড়ার অভ্যেস কমে গেছে। টেলিভিশন সেই জায়গাটা নিয়েছে। দেখা যাবে, অনেক বাড়িতে প্রায় সারাক্ষণ বোকাবাক্স চালু রয়েছে। বাড়ির গৃহিণী দেখছেন। কাজের মহিলাও। টেলিভিশনের আকর্ষণী ক্ষমতা ধরে রাখছে সকলের মনোযোগ। বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা রয়েছে স্কুলের, অন্য ঘরে টিভি চলছে। পড়াশোনা করলেও ছেলেটি বা মেয়েটির কান এবং মন সজাগ থাকছে টেলিভিশনের শব্দের দিকে। অন্য ঘর থেকে একটু-আধটু শব্দ তো ভেসে আসছে। খবরের কাগজ নিজস্ব ভঙ্গিতে বহু জিনিস পরিবেশন করলেও তা মন ভরাতে পারছে না পাঠকদের। এর ফলে একটা বড়রকম ধাক্কা খাচ্ছে মুদ্রিত গণমাধ্যম। এখন কাগজের ছাপাটাপার মান অনেক উন্নত, কাজের মধ্যে যথেষ্ট দ্রুততা আছে, আকর্ষণীয় বেশ কিছু জিনিস থাকছে, কিন্তু কিছুতেই পাঠকের মনের কাছে পৌঁছোনো যাচ্ছে না। সেজন্যেই কি টেলিভিশনের কিছুটা অনুকরণে আগ্রহী প্রিন্ট মিডিয়া?

খবরের কাগজের থেকে অনেক পরে এদেশে এসেছে টেলিভিশন। টেলিভিশনের আগে এসেছে রেডিও। রেডিওর বয়স প্রায় আটদশক। টেলিভিশন এসেছে পাঁচ দশকের কাছাকাছি সময়ে। রেডিও যখন এলো তখন সংবাদপত্রকে ভাবতে হয়নি কিছু। কাগজ তার নিজস্ব ব্যবসার জগৎ বুঝে নিতে পারত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা চলত অন্যান্য কাগজের সঙ্গে। কারণ অনেকটা নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল। টেলিভিশন তার প্রভাব দ্রুত ছড়ানোর পর মুদ্রিত গণ্যমাধ্যম ধাক্কা খেয়েছে। যে ধাক্কা এলো বাইরে থেকে। প্রথম দিকে বলা হোত, টেলিভিশন তার মতো চলবে, খবরের কাগজের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না। পরে দেখা গেলো অন্য ছবি। খবরের কাগজের লোকজন টেলিভিশন প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা অন্যভাবে সবকিছু পরিবেশনের পরিকল্পনা নিলেন। উদ্দেশ্য, টেলিভিশনের কিছু দর্শককে যদি পাঠক হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হলো কি?

কাগজ নিজের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য যদি হারায় তাহলে তা ফিরে পাওয়া কঠিন। এরকম অবস্থাকে কি বলা যায়? না ঘরকা, না ঘাটকা। কাগজ নিজস্ব পাঠক হারাবে সেইসঙ্গে টেলিভিশনের অক্ষম অনুকরণ করতে গিয়ে কাগজের মান নামবে। তাতে টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতাদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। সংস্কৃত ভাষায় মহাজন বাণী রয়েছে, যা এক্ষেত্রে মোক্ষম বলা চলে! 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ।' অর্থ অত্যন্ত

দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু পরিবেশনের মধ্যে থেকে যায় অনেকটা তারল্য। তরল প্রমোদ উপকরণে জনমন আকর্ষণের মধ্যে গণমাধ্যমের নিজস্ব গৌরব ধারাবাহিক ভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রায় একতরফা ভাবে টেলিভিশনের পরিচালকরা নিজেদের পছন্দের বিষয় পাঠকদের খাওয়ান বা খেতে বাধ্য করেন। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই 'খাওয়া' শব্দটা বেশ চালু। 'এটা পাঠক ভালো খাবে' একথা কাগজের লোকজন বলতে অভ্যস্ত। টেলিভিশনের লোকজনও বলে, 'এরকম অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতারা ভালো খায়।' অতএব সর্বত্র চলছে খাওয়ানোর ব্যাপার। এর জন্য মস্তিষ্ককে সজাগ রেখে উন্নত মানের কিছু পরিবেশনের বদলে চড়া মাত্রার বা মোটা দাগের জিনিস খাদ্য হিসেবে রাখা হচ্ছে।

পরিষ্কার। নিজের পথ মত অনুসরণ করে হার স্বীকার ঠিক আছে, কিন্তু পরের মত ও পথ চোখ বুঝে অনুকরণ করা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। এ যেন অনেকটা জুয়া খেলার মতো। এমনটা করে দেখা যাক, যদি লেগে যায় ভালো। না লাগলে ঝুঁকি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

এক সময় বলা হোত টেলিভিশন তার নিজের পথে এগোবে। খবরের কাগজ কখনও তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে না। দুটি মাধ্যমের পথ আলাদা। মুদ্রিত গণমাধ্যম পাঠককে ধরতে নানারকম উদ্যোগ নেবে। দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের ক্ষমতা বেশি, তার শ্রোতা দর্শক অন্যস্তরের। খবরের কাগজ জনরুচির সঙ্গে আপস করার জন্যে নিজস্ব পরিবেশন রীতি নীতি বদলাবে না। এরকম ঘোষণা অলিখিত হলেও টেলিভিশনের ক্রমবর্ধমান দাপটের কাছে মুদ্রিত গণমাধ্যম ক্রমশ যেন হার মানতে চেয়েছে। অথচ এমনটা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না।

যা ছাপা হয় তা বহুজনের হিত ও সুখের কথা মনে রেখেই। টেলিভিশনে যা প্রচারিত হয় তার মধ্যেও বহুজনের হিত কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে 'বহুমনোরঞ্জনী' শব্দটা। একই সঙ্গে একই জিনিস বহুজন এক সময়ে দেখার পর কার কেমন প্রতিক্রিয়া জানা যাচ্ছে। রুচির তারতম্য থাকলেও টেলিভিশন যেন এক ছাঁচে জনরুচি গড়ে তুলতে চাইছে। যে ফ্যাশনের সঙ্গে নগরীর সম্পন্ন পরিবারের কিশোরী পরিচিত হচ্ছে তার বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোরীর কাছে। ফ্যাশনের দাবি মেটানো শহরের মেয়েটির পক্ষে হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু গ্রামের মেয়েটির পক্ষে তা ব্যয়সাপেক্ষ। গ্রামের মানুষের অভ্যস্ত চোখ সব নতুন ফ্যাশনকে সুনজরে দেখতে বা মানতে অভ্যস্ত নয়। হয়তো অক্ষমতায় অনেকে মন্তব্য করবেন, 'টেলিভিশন দেখে দেখে মেয়েদের লজ্জাশরম বলে কিছু রইল না।' আমরা আরও পিছনে গিয়ে দেখতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মশাই আক্ষেপ করেছেন স্ত্রীশিক্ষার কুফল সম্পর্কে। একদিকে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মুদ্রণ যন্ত্রকে আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নিয়ে। অন্যদিকে গোঁড়ামতাবলম্বীরা বলছেন, 'মেয়েরা লেখাপড়া শিখে উচ্ছন্নে গেল।' সমাজ সবসময়েই বাঁকা চোখে দেখেছে প্রগতির অনেক কিছু। প্রগতি সংহারের নানারকম চেষ্টা জোরদার হয়েছে। বাধা অতিক্রম করার জন্যে অনেক রকম লড়াই চলেছে। হয়তো সেরকম ভাবেই অনেকের ধারণা হয়েছে টেলিভিশন জনরুচির অবনমন ঘটাচ্ছে। মুদ্রিত গণমাধ্যম সর্বত্রগামী নয় বলেই তাকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। গণ্ডীকে বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাগজের পরিচালকরা টেলিভিশনের দেখানো পথে হাঁটতে চাইছেন।

যে কোনও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেই গভীরতা থাকা দরকার। একটু মননচিন্তন সমৃদ্ধ কাজ হলে গণমাধ্যমের মান বাড়বে। জনরুচিকে উন্নত করা সম্ভব। আমরা প্রগতির পথিক, জনরুচি নিম্নগামী হোক --- এটা কোনভাবেই চাইবো না। টেলিভিশনের ব্যাপ্তি ব্যাপক হয়ে উঠেছে। দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু পরিবেশনের মধ্যে থেকে যায় অনেকটা তারল্য। তরল প্রমোদ উপকরণে জনমন আকর্ষণের মধ্যে গণমাধ্যমের নিজস্ব গৌরব ধারাবাহিক ভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রায় একতরফা ভাবে টেলিভিশনের পরিচালকরা নিজেদের পছন্দের বিষয় পাঠকদের খাওয়ান বা খেতে বাধ্য করেন। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই 'খাওয়া' শব্দটা বেশ চালু। 'এটা পাঠক ভালো খাবে' একথা কাগজের লোকজন বলতে অভ্যস্ত। টেলিভিশনের লোকজনও বলে, 'এরকম অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতারা ভালো খায়।' অতএব সর্বত্র চলছে খাওয়ানোর ব্যাপার। এর জন্য মস্তিষ্ককে সজাগ রেখে উন্নত মানের কিছু পরিবেশনের বদলে চড়া মাত্রার বা মোটা দাগের জিনিস খাদ্য হিসেবে রাখা হচ্ছে। মুখোরোচক খাদ্যে দর্শক শ্রোতার মন যেভাবে টেলিভিশন ভোলাচ্ছে, পাঠকদের সেভাবে মনোরঞ্জনী খোরাক পরিবেশন করে আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছে মুদ্রিত গণমাধ্যম। আমরা যে এগিয়ে চলেছি তার কোনও নজির মিলছে না। এগিয়ে যাওয়ার অবশ্য দুটো দিক আছে। ১. সামনের দিকে এগোন ২. পিছনের দিকে এগোন। আমরা বোধহয় সবদিক থেকে পিছনের দিকে এগোচ্ছি। গণ্যমাধমে তারই প্রতিফলন ঘটছে। মুদ্রিত গণমাধ্যম কম শক্তিধর ঠিকই, কিন্তু মুদ্রিত রূপ থেকে যায়। উত্তরকাল খুব সহজেই নির্দিষ্ট সাল তারিখের কাগজ পেতে পারে। এখন বিভিন্ন কাগজের নানান সংস্করণ হলেও কোথাও-না-কোথাও পূর্ণ মুদ্রিত চেহারা মিলবে। কিন্তু টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের প্রচার ব্যাপক হলেও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হারায়। তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। খুবই কঠিন। দ্রুত প্রচার, দ্রুত লয়। এরকম অবস্থায় আমাদের প্রশ্ন নিজেদের কাছেই। মুদ্রিত গণমাধ্যম কি চেতনাসম্পন্ন হতে পারে না? চেতনা এবং চরিত্রভ্রষ্ট হলে সমস্যা বেড়ে চলে। প্রায় সব গণ্যমাধ্যম দপ্তর গতানুগতিক ভঙ্গিতে কাজ করায় অভ্যস্ত হওয়ায় নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গাগুলো ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের কাজই হলো, নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা। তা না হলে পাঠকরা আকর্ষণ খুঁজে পাবে কীভাবে? টেলিভিশনও যদি না করে তাহলে বোকা বাক্সের সামনে বসা বা দাঁড়াবার লোকজন কমতে বাধ্য। দেশের জনসমষ্টির সত্তর শতাংশের বেশি মানুষের বয়স ৩৫-এর আশেপাশে। তারা অনেকেই এখন কাগজ পড়তে চাইছে না। টেলিভিশনের প্রভাবে নয়, এমনিতেই কাগজ কোনরকম আগ্রহ জাগাতে পারছে না। তারপর পাঠে-অনীহা তো দিনে দিনে বাড়ছে। তবে এরকম চলতে থাকলে পাঠক সম্বন্ধে বলা হবে 'এক বিরল প্রজাতির জীব যারা সচরাচর কিছুই পড়তে চায় না। যা পড়ে তা গভীরতায় গ্রহণ করে না। কিছু মনে রাখে না। পড়ার পর মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যায়।' এরকম অবস্থা চলতে থাকলে সুস্থ ও স্বাভাবিক পাঠ-রুচি কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব— আগামীদিনের ছবি কেমন হবে?

এরকম পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম বিশেষ করে মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। টেলিভিশনকে অনুকরণ না করে নিজের চরিত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা যদি কাগজ না করে তাহলে হতাশার ছবিই চারপাশে দেখতে বাধ্য হবো আমরা। বলতে এবং মানতে হবে তখন, মিডিয়ার ম্যাজিক তার ক্ষমতা হারিয়েছে সবদিক থেকে।

ভারতের নিরাপত্তা কীভাবে রক্ষিত হবে?

অতিথি কলম

অশোক কুমার মেহতা

অবশেষে সাত বছর পর সরকার জাতীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁদের নীতি ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা অভিনন্দনযোগ্য। নরেশ চন্দ্র পরিচালিত ১৪ সদস্যের টাস্কফোর্স অবশেষে জানিয়েছেন যে তাঁরা বর্তমান নিরাপত্তা পদ্ধতির খুঁটিনাটি নিয়ে সমীক্ষা করেছেন এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে কীভাবে আঁটোসাটো করা যায় তা নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা না দেওয়াটা অযৌক্তিক নয় কি? এইসব নিয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্র ও প্রশাসনিক আমলাদের। মনে রাখা দরকার যে নিরাপত্তা ব্যাপারটা প্রতিরক্ষা, কূটনীতি ও উন্নয়ন এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার পদে নিযুক্ত করা যায় না।

দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে কোনও স্ট্রাটেজি না থাকলে ঠিকমতো ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যাবে না। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে কোনও স্ট্র্যাটেজি আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি, তৈরি হয়নি জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে কোনও দলিল, এমনকি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও শ্বেতপত্রও প্রকাশ করা হয়নি। লক্ষণীয় চীন ১৯৯৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৭টি নিরাপত্তা বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। এছাড়া ঘোষণা করেছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আচরণ বিধি।

কার্গিল রিভিউ কমিটির পর ২০০১ সালে সর্বাত্মক জাতীয় নিরাপত্তা রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। কয়েকজন মন্ত্রী এই রিপোর্ট তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের পরামর্শ অনেকটাই গৃহীত এবং বাস্তবায়িতও হয়েছিল। ২০০৮ সালে বোম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নাশকতার পর আবার নিরাপত্তা বিষয়ে সমীক্ষার দরকার হয়। কিন্তু আমরা নিরাপত্তা বিষয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি।

আমাদের পূর্বেকার রিপোর্ট ছিল মূলত প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক। যার ফলে পরবর্তী যুদ্ধে অনেক ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলো। ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা বিষয়ে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার ফলশ্রুতি হলো চীনের কাছে অপমানজনক পরাজয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ থেকেও আমরা কিছু শিখিনি পরবর্তী যুদ্ধ থেকেও নয়। কারণ সরকার যুদ্ধ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি চেপে রেখেছেন।

১৯৭১ সালে ডি. পি. ধর কমিটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কিছু অভিমত পেশ করেছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালের তেল বিক্রয়ের জন্য সেই অনুমোদনগুলি কার্যকর করা যায়নি। পরে পি. এন. হাকসারের নেতৃত্বে অ্যালকম ২ কমিটি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ১৯৮০-র দশকে রাজীব গান্ধী একটি আপ্ত ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে সমীক্ষা করা। এই রিপোর্টে পরমাণু তৈরির কথা বলা হয়েছিল।

১৯৯০ সালে অরুণ সিং ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচারী কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। এই কমিটি প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় সঙ্কোচনের কাজ তো বলেইনি বরং ব্যয় বৃদ্ধির কথা বলেছিল। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে প্রথম চীফ অফ দি ডিফেন্স স্টাফ পদের সৃষ্টি করেছিলেন। অরুণ সিং-এর কমিটি ভাইস-চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদ সৃষ্টির কথা বলেছিল। ভাইস চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ তিনটি প্রতিরক্ষা বিভাগ ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

২০০১ সালে একদল মন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও নিরপত্তা বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ৩৪০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছিল। একমাত্র চীফ অফ দি ডিফেন্স পদের প্রতিষ্ঠানীকরণ ছাড়া সবকটি অনুমোদন সরকার গ্রহণ করেছিল। এরমধ্যে দুটি হলো ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড। কিন্তু ২৬/১১-র বোম্বাই হামলা পর্যন্ত এগুলি নিষ্ক্রিয় ছিল।

সরকার স্পষ্টতই স্বীকার করে নিয়েছে যে বহিরাক্রমণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়েছে এবং শেষেরটি বেশি বিপদ ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা মোকাবিলার দায়িত্ব রাজ্যগুলির ওপর বর্তায়। দেখা যাচ্ছে যেখানে মাওবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা এ কে ৪৭ সহ অতি বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার করছে যেখানে রাজ্য পুলিশের হাতে রয়েছে মাত্র লাঠি ও ৩০৩ রাইফেল। স্মর্তব্য, চীন প্রতিরক্ষার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে।

বোম্বাই হাঙ্গামা পরবর্তী যে সংস্কারগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তা মুখ্যতঃ মহারাষ্ট্র ও কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মোকাবিলার ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সম্পর্কের ভিত্তি দুর্বল।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত অ্যাডভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান কে শঙ্কর বাজপেয়ী তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন : আজকের ভারত বিশ্বসভায় একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসেবে স্থানলাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-প্রক্রিয়া, নীতি-নির্ধারণ বিষয়

খুবই শিথিল। তিনি দেখিয়েছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক বৈরিতাপূর্ণ।

যদিও নরেশ চন্দ্র পরিচালিত টাস্ক ফোর্সকে ২০০১ সালের হেভিওয়েট গ্রুপ মিনিস্টারদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না তবুও চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদটির প্রতিষ্ঠানীকরণের বিষয়ে টাস্কফোর্সের বিষয়ে অনুমোদন মেনে নেওয়া উচিত। এটা ঠিক কোনও দেশেই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের প্রতিষ্ঠানীকরণের ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয় না তবুও বিভিন্ন দেশের সরকারের চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদ সৃষ্টির ইচ্ছা থাকে। সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য একজন চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফের প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার দিতে হবে, সেইসঙ্গে দিতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। তাছাড়া সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের সম্পর্ককে করতে হবে স্বচ্ছন্দ।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে সামরিক অফিসারদের ক্ষমতা না দেওয়াটা অযৌক্তিক নয় কি? এইসব নিয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্র ও প্রশাসনিক আমলাদের। মনে রাখা দরকার যে নিরাপত্তা ব্যাপারটা প্রতিরক্ষা, কূটনীতি ও উন্নয়ন এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার পদে নিযুক্ত করা যায় না।

সেকারণ তাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটের মিলিটারি অ্যাডভাইসার করা হলো।

সামরিক বাহিনীর ওপর অসামরিক বাহিনীর এই যে খবরদারি এটি সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে এবং যে কোনও সময় এই ক্ষোভ ফেটে পড়তে পারে। নতুন টাস্ক ফোর্সকে এই অনুমোদন দিতে হবে যে সরকার নয়, তারাই রাজনীতি ও রণকৌশল বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশাবলী দিতে পারে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে। মন্ত্রীদের যে সমস্ত অনুমোদন এখনও গৃহীত হয়নি অতি দ্রুত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেগুলি কার্যকর করতে হবে।

২০০১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ ক্ষমতার অনুপাত ছিল ১.৮ : ১, অন্তরীক্ষ বাহিনীর ৩ : ১। চীনের সঙ্গে ভারতের এই ব্যাপারে তুলনা করা লজ্জাকর। সাম্প্রতিককালে পেন্টাগন রিপোর্টে জানিয়েছে ভারত নয় সামরিক ব্যাপারে 'চীন থেকে দূরে' থাক।

জেনারেল কে. সুন্দরজী চীনকে প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৮৭ সালে যে 'আর্মি প্ল্যান— ২০০০' ঘোষণা করেছিল তা আজও কাগজে-কলমে রূপায়িত হয়নি। যদি এই প্ল্যান আজ অনুমোদিত হয় তবে তা বাস্তবায়িত হতে আরও পাঁচ বছর লাগবে— যার অর্থ চীন এই সময়ে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

আমরা বৃটেন থেকে প্রথা, ঐতিহ্য, অভ্যাস ইত্যাদি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, কিন্তু আমরা একটা জিনিস রপ্ত করতে পারিনি, তা হলো সময়মতো প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার পর্যালোচনা করা। আমরা শৈথিল্যের দাস হয়ে পড়েছি; ব্যাপারখানা যেন 'চলছে চলুক'। বৃটেন তার সামরিক বাহিনীকে একটাই নির্দেশ দিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার যা কিছু অন্তরায় তা সমূলে বিনাশ কর।

ভারতের স্বভাব হলো একের পর এক আঘাতের পর একটু জেগে ওঠা। এই মাসে আরেকটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। নরেশ চন্দ্রের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্সকে নতুন প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নীতির উদাহরণ তৈরি করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে ভারত যেন অবাধে উন্নয়নের লক্ষে পৌঁছতে পারে।

(১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে দ্য পাইওনীয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত A Strategy to Secure India নিবন্ধের কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী কৃত অনুবাদ)

খুনেদের চেয়েও বিপজ্জনক

তাত্ত্বিক মাওবাদীদের মোকাবিলা করাই চ্যালেঞ্জ মমতার

সাধন কুমার পাল

মাওবাদীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যে কোনও সরকারকে দু'রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ১. রাজনৈতিক, ২. সশস্ত্র মোকাবিলার কৌশলজনিত সমস্যা। প্রথম সমস্যাটি অর্থাৎ রাজনৈতিক সমস্যার জন্যই কী কেন্দ্র কী রাজ্য কোনও সরকারই দ্বিতীয় সমস্যা অর্থাৎ সশস্ত্র মোকাবিলার যতরকম পন্থা-পদ্ধতি আছে তার সবগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে না। দেশে যতগুলি রাজ্য মাওবাদী সমস্যা মোকাবিলা করছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই বোধ হয় একমাত্র রাজ্য যেখানে বিগত বামফ্রন্ট সরকারকে এই সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএমের ক্ষমতায় টিকে থাকার অপকৌশল জাত রাজনৈতিক ভাবমূর্তিই যে সে সময় রাজ্য সরকারের সামনে এই ধরনের সমস্যা তৈরি করেছিল এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

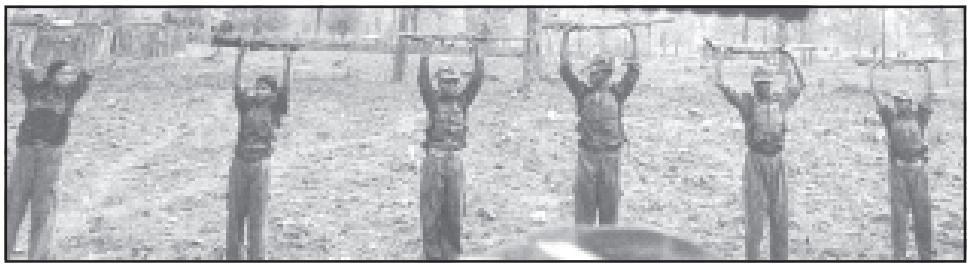

সিপিএমের এই ধরনের ভাবমূর্তি এক দিনে তৈরি হয়নি। বাম শাসনের প্রথম দিকে বিরোধী শিবিরের তৃণমূল স্তরের লোকেদের গায়ে গরীবের শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দালাল, ইত্যাদি তকমা এঁটে এমন দাওয়াই দেওয়া হোত যে খুব বেপরোয়া না হলে কেউ সিপিএম দলের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পেতো না। গরীবের ভাগ্য ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা সিপিএমের 'মুক্তির দূত' ভাবমূর্তিতে তখন সচেতন মানুষ থেকে মিডিয়া এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে এদের এই সমস্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধি সম্পন্ন দমনপীড়নকেও ছোটখাটো ব্যাপার বলে কেউ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করত না।

এক সময় এই সমস্ত দমনপীড়ন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যেতে থাকলে সিপিএম-এর স্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে। পাশাপাশি উত্তর থেকে দক্ষিণে মাথা চাড়া দিতে থাকে ভয়ংকর সব সমস্যা। কোথাও বা রাজ্য ভাগের দাবি আবার কোথাও বা মাওবাদী সমস্যা। কিন্তু বিগত বামফ্রন্ট সরকারের তরফে এই সমস্ত সমস্যা মোকাবিলার ধরন-ধারণ দেখে আম-জনতার মনে ক্রমশ এরকম একটি প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে যে, এই সমস্যাগুলি বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সিপিএমের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়নি তো? কারণ এই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টির মূল কারণ যে দীর্ঘদিনের অনুন্নয়ন, বঞ্চনা ও বিরোধী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে একথা সিপিএম একবারের জন্যও স্বীকার করেনি। উল্টে মানুষকে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে বিরোধীরা দক্ষিণে মাওবাদী ও উত্তরে রাজ্য-ভাগের দাবীদারদের সঙ্গে জোট বেধে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে এরাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। সুতরাং এরাজ্যে বামফ্রন্টকে সরিয়ে বিরোধীদের ক্ষমতায় বসানো মানে রাজ্যের সর্বনাশ করা।

বামেদের এই সমস্ত প্রচার দেখে অনেকের মনেই এই ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল যে, বামফ্রন্ট এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেয়ে এগুলোকে সামনে রেখে নতুন করে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসতে চাইছে না তো? ২০০৯-এর জুন মাস থেকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মাওবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে গোটা জঙ্গলমহলকে বিরোধী শূন্য করে ফেলাই ছিল ওই এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য এবং সশস্ত্র মোকাবিলাটা মাওবাদীদের সঙ্গে হলেও এই ইস্যুতে রাজনৈতিক মোকাবিলাটা ছিল মূলত প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ায় দোল খেতে থাকা একটি সরকারের এই ধরনের ভুল পদক্ষেপের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে মাওবাদীরা। ফলে জনগণের কমিটির মতো মাওবাদীদের প্রকাশ্য মুখ বলে পরিচিত সংগঠনগুলির যাবতীয় প্রচার ও অভিযোগ মানুষের কাছে যতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে সরকারের বক্তব্য ততটা হয়নি। যৌথবাহিনীর অভিযানের প্রতিটি পদক্ষেপ কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছে। অনুজ পান্ডের মতো সিপিএম নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠলেও জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের জন্য সরকার কিছুই করেনি, উল্টে হার্মাদবাহিনী তৈরি করে যৌথবাহিনী নামিয়ে বন্দুকের সাহায্যে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, এরকম একটি ছবিই সে সময় তৈরি হয়েছিল।

এই জন্যই সে সময়ের বিরোধী নেত্রীর তরফে এ রাজ্যে মাও-ফাও বলে কিছু নেই, জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে জাতীয় বক্তব্যও মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

আর দশটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মতো অন্তর্ঘাত, নরহত্যা, ধ্বংসলীলা চালালেও মাওবাদীদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয় না। এর কারণ বোধহয় এটাই যে, মাওবাদীরা এদেশেরই মানুষ এবং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে এরা প্রত্যেকটি ভয়ংকর ঘটনার পিছনে বৃহত্তর জনস্বার্থের যুক্তি খাড়া করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। যেমন, কোনও স্কুল বাড়ি বা সেতু ধ্বংস করলে

যুক্তি দেওয়া হয় এই সমস্ত পরিকাঠামো ব্যবহার করে পুলিশ অর্থাৎ 'সরকারি গুণ্ডা'রা গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করছিল সেজন্য এগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। গরীব মানুষকে হত্যা করলে যুক্তি দেওয়া হয় এরা পুলিশের চর হিসেবে কাজ করছিল, আবার পুলিশ মারলে যুক্তি দেওয়া হয় গরীব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে সরকারি বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করছিল বলে এদের মৃত্যু হয়েছে এবং এর জন্য তারা দুঃখিত। এদের হয়ে কথা বলার জন্য যে সমস্ত প্রকাশ্য সংগঠন আছে সেগুলির নাম এমন ভাবে রাখা হয় যা শুনলে যে কোনও মানুষের মনে হবে এটি তারই নিজস্ব সংগঠন। যেমন, পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি।

তবে মাওবাদীরা ওদের কৃতকর্মের জন্য যতই সাফাই দিক না কেন ওদের সমস্ত ধ্বংসাত্মক ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল উদ্দেশ্য যে চলমান সংসদীয় ব্যবস্থাটিকে চরম ব্যর্থ প্রমাণ করে, এটির প্রতি ঘৃণা তৈরি করে, মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথই যে একমাত্র পথ এটা প্রমাণ করার জন্য, নানা দুর্নীতি সত্ত্বেও আম-জনতার উন্নয়নের জন্য যতটুকু বরাদ্দ অকুস্থলে পৌঁছায় রেশন ডিলার, ঠিকাদার বা সরকারি কর্মচারীদের মাথায় বন্দুক ধরে সেটুকুতেও ভাগ বসিয়ে বা কাজ করতে না দিয়ে এবং মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, সেতু ধ্বংস করে এক অনুন্নত যন্ত্রণাময় আদিম পরিস্থিতি তৈরি করা। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সবমিলে বলা যায় পুরোদস্তর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ ও অনৈতিক হত্যার সাথে যুক্ত থেকেও নিজেদের গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগতে না দেওয়ার রাজনৈতিক যুদ্ধে মাওবাদীরা অনেকাংশে সফল।

বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় ছিল সে সময় এরা মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝে এমন ভাবে কথা বলত যেন মনে হোত বিরোধী তৃণমূলের সঙ্গে এদের বক্তব্যের তেমন কোনও তফাত নেই। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সিপিএমের জায়গায় তৃণমূলকে বসাতে মাওবাদীদের সময় লাগেনি। কারণ হার্মাদ বাহিনীর জায়গায় ভৈরব বাহিনীর অত্যাচারের গল্প বানিয়ে, যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো মমতা ব্যানার্জীকে আরও বেশি স্বৈরাচারী অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে, সাময়িক অভিযান বন্ধের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ছত্রভঙ্গ অবস্থাকে গোছগাছ করে সংগঠিত হয়ে ওরা আবার যুদ্ধংদেহি হয়ে উঠেছে।

দেশের বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও মাওবাদীদের সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ এদেশে সংবিধান অনুসারে একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া সম্ভব। আর মাওবাদীরা সশস্ত্র পথে সেই ক্ষমতা হাতে পেতে চায়।

দেশের বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও মাওবাদীদের সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ এদেশে সংবিধান অনুসারে একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া সম্ভব। আর মাওবাদীরা সশস্ত্র পথে সেই ক্ষমতা হাতে পেতে চায়।

সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনা ঠিক কোথায় আটকে বিশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে মাওবাদ অধ্যুষিত কোনও একটি অঞ্চল যেমন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের মতো কোনও এলাকার নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে এই শান্তি আলোচনা সদর্থক হতে পারে এমন বার্তাই নাকি মাওবাদীদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। মাওবাদীদের তরফে এই ধরনের বার্তা আসাটাই যে স্বাভাবিক ব্যাপার, প্রতিবেশী নেপালে মাওবাদীদের উত্থান ও ক্ষমতা ভাগাভাগির ইতিহাসে চোখ রাখলেই তা স্পষ্ট হবে। সন্দেহ নেই যে এই ধরনের কোন শর্তে সরকারের রাজি হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাওবাদীদের কোনও রকম অন্যায় আব্দারের প্রতি বর্তমান সরকারের নরম হওয়ার প্রশ্নই নেই। কারণ রাজনৈতিক ভাবে ব্যাকফুটে থাকা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গেই এঁরা এটে উঠতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা বর্তমান সরকারের সঙ্গে একবার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে মাওবাদীরা যে কতটা ব্যাকফুটে চলে যাবে তা বোধ হয় এই মুহূর্তে কল্পনা করাও মুস্কিল।

মাওবাদীদের এই ধরনের মনোভাব সত্ত্বেও আলোচনা প্রক্রিয়া চালানো দরকার। কারণ এতে মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে মাওবাদীরা মানুষের বঞ্চনা অনুন্নয়ন অবহেলার অবসানের জন্য নয় এরা আসলে লড়ছে সশস্ত্র পথে ক্ষমতা দখলের জন্য। যা কিনা মাওবাদী মোকাবিলার পথে সরকারকে বাড়তি রাজনৈতিক সুবিধা দেবে। সর্বশেষ খবর অনুসারে মাওবাদীরা রাজ্য সরকারের কাছে যৌথবাহিনীর অভিযান বন্ধ রাখার শর্তে এক মাসের জন্য অস্ত্র সংবরণ করার প্রস্তাব দিয়েছে। আবার এদিকে মমতাও জঙ্গলমহলে সভা করে মাওবাদীদের অস্ত্রসমর্পণের জন্য সাতদিনের সময় দিয়েছে। গত ২২ অক্টোবর সেই সময়সীমাও শেষ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে এমন একটি বার্তা যাচ্ছে যে মমতাও বামফ্রন্টের মতো মাওবাদীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার পথেই হাঁটছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এই বার্তা মাওবাদী তাত্ত্বিকদের হাতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন অস্ত্র তুলে দেবে। যেমন মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখিকা ও এস ইউ সির মতো রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হয়েছে। এদের মোকাবিলা করার জন্য এবং মাওবাদের দূষণ যাতে আর ছড়াতে না পারে তার জন্য যৌথবাহিনীর স্টাইলে মাও-মার্কস দূষণ মুক্ত যৌথ তাত্ত্বিক ফ্রন্ট খোলাটা বোধহয় এখন খুবই জরুরী। সবমিলে বলা যায় যে বার্তাটি দিয়ে বর্তমানে মমতার মাও মোকাবিলা করা উচিত তা হলো, আলোচনা চলতে পারে কথা হতে পারে তবে মানুষ খুন হলে, মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ করে দেওয়ার কোনও রকম প্রয়াস হলে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি নিয়ে তা মোকাবিলা করা হবে।

হার্মাদ না ভৈরব : নিরন্ন মানুষের কিছু আসে-যায় না

অর্ণব নাগ

একশ' শতাংশ সত্যি কথা। লাল ফেট্টি বাঁধা হার্মাদ বাহিনী কিংবা সবুজ ফেট্টি (ওটা অবশ্য অদৃশ্য) বাঁধা ভৈরব বাহিনী— নিত্যদিনের জীবন-সংগ্রামে জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের ওপর এসব আর কোনও প্রভাব ফেলে না। ফিকে লাল আর ফ্যাকসা সবুজের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ছাপিয়ে তাদের কাছে একটি রঙ-ই এখন গুরুতর সত্য— সেটা হলো গাঢ় লাল। যা আপাতত জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে মাওবাদী ও রক্ত— এই দুই শব্দযুগলের সমার্থকতারই পরিচয় বহন করে আনছে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। বাম জমানায় মাওবাদীরা জঙ্গলমহলের মানুষকে সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর জুজু দেখিয়েছিল, আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় তৃণমূলের ভৈরববাহিনীর জুজু দেখানো হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য, হার্মাদবাহিনী নামে সিপিএমের দুষ্কৃতকারী, খুনে-গুন্ডাদের যে সংগঠনটি পরিচালিত হোত, জঙ্গলমহলের মাটিতেও তার অবিসম্বাদিত অস্তিত্ব ছিল। যৌথবাহিনীকে ঢাল করে ও এই হার্মাদবাহিনীর ওপর নির্ভর করেই যে সিপিএম জঙ্গলমহল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল তাও কারুর অজানা নয়। মহাশ্বেতা দেবী, সুজাত ভদ্রের মতো মাওবাদীদের প্রতি অতি-সহানুভূতিশীল মানুষেরা যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিলেন সেই সময়ই। আর তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাতে সর্বান্তকরণ সমর্থন ছিল। এমনকী ক্ষমতায় আসার পর যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করবেন বলে আগাম সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিয়ে নিয়েছে। রাজ্যে পালাবদল জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে কতটা তাৎপর্যবাহী, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন অশিক্ষা, নিদারুণ দারিদ্র, জীবনযুদ্ধের সঙ্গে গোলা-বারুদের যুদ্ধের মধ্যে নিরন্তর যুঝতে থাকা সেই মানুষগুলো বেঁচে-বর্তে থাকার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা দুঃস্বপ্নে রূপান্তরের দায় নেবে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার তার দায় এড়াতে পারে না, একথা মাথায় রেখেও স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে তাত্ত্বিক আর হত্যাকারী— এই দুই মাওবাদী-সত্ত্বার ওপরই এর সম্পূর্ণ দায়ভার বর্তায়। প্রকৃতপক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে স্রেফ তাঁর মুখ্যমন্ত্রী-পূর্ব কৃতকর্মের জন্য সামান্যই দায়ী করা চলে, আসল কালপ্রিট তাত্ত্বিক মাওবাদীরাই। জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনী রয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের অভিযান

আপাতত বন্ধ। সবচেয়ে বড় কথা যৌথবাহিনী-কে শিখণ্ডী খাড়া করে এলাকা দখলের যে উদ্দেশ্য সিপিএমের ছিল এই মুহূর্তে তা অসম্ভব। বরঞ্চ সিপিএমের সেই উদ্দেশ্য-ই এখন দৃশ্যমান হচ্ছে মাওবাদীদের মধ্যে।

হার্মাদবাহিনীর পরিবর্তে তৃণমূলের দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠী হিসেবে ভৈরববাহিনীর অত্যাচারের যে প্রসঙ্গ এসেছে, তার যৌক্তিকতা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথম কথা, এলাকা দখলের যে তাগিদটা হার্মাদবাহিনীর ছিল, ভৈরববাহিনীর সেই তাগিদটা থাকার কথাও নয়। কারণ রাজ্যের ক্ষমতায় এখন তৃণমূল কংগ্রেস; ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার জঙ্গলমহলে গিয়েছেন, উন্নয়নের ঢালাও প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ভৈরববাহিনী নিষ্প্রয়োজন, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এলাকা রাজ্য সরকারের। তাই সঙ্গতভাবেই মনে হয়, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং শান্তিকামী প্যাকেজ (যার মধ্যে মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ ফলপ্রসূ প্যাকেজটিও রয়েছে)-এর ঘোষণা জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেওয়ায় তাত্ত্বিক মাওবাদীরা সিপিএমের আমলের একটা 'ডামি' খাড়া করতে চাইছে। যেমন, হার্মাদবাহিনীর পরিবর্তে ভৈরববাহিনী, সুশান্ত ঘোষের পরিবর্তে শুভেন্দু অধিকারী, অনুজ পান্ডে, রথীন দণ্ডপাটদের পরিবর্তে তৃণমূলী বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, সুকুমার হাঁসদা প্রমুখ— এদেরকে খাড়া করে তাত্ত্বিক মাওবাদীরা বোঝাতে চাইছে মুদ্রার একপিঠে সিপিএম, অপরপিঠে তৃণমূল। তাত্ত্বিকদের পক্ষে ওকালতি করে স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবী যৌথবাহিনীর অভিযান বন্ধ নয়, একেবারে অপসারণই দাবি করে ফেলেছেন!

আর তাত্ত্বিক মাওবাদীদের এই তত্ত্ব কার্যকর করতে খুনে মাওবাদীরা সিপিএম নেতা-কর্মীদের ছেড়ে তৃণমূলী নেতা-কর্মীদের দিকে মন দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাতদিনের চরম সময়-সীমা কবেই এক্সপায়ার হয়ে গেছে। শান্তি আলোচনা আপাতত কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে গেছে সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা পরিচালনার কাণ্ডারী মধ্যস্থতাকারীরা হাত গুটিয়ে নেওয়ায়। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় মমতা ব্যানার্জি এদের ওপর অসন্তুষ্ট-ই ছিলেন, কিন্তু মাওবাদীরা মধ্যস্থতাকারীদের ওপর আচমকা অনাস্থা জানাল কেন— 'গট আপ গেম' খেলে না কি পায়ের তলার সরে যাওয়া মাটি মরিয়া হয়ে জোর করে ধরে রাখতে, তা পরিষ্কার নয়।

কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, হার্মাদবাহিনী না ভৈরববাহিনী, জঙ্গলমহলের সাধারণ নিরন্ন মানুষের কি এসে গেল? পরিবর্তনের বাজারে যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন বুনো ভুদূর ফল সেদ্ধ আর নয়, দু'টো চাল ফুটিয়ে খাবেন, তাদের তা দুঃস্বপ্নে রূপান্তরের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল কোনওমতেই এড়াতে পারে না। সংবাদপ্রকাশ— জঙ্গলমহলের খোলা বাজারে পাচার হচ্ছে ভর্তুকির চাল। বিপিএল কার্ডের ছবি তুলতে দেখাতে হচ্ছে তৃণমূলের প্রতি আনুগত্য। হায় রে! এর সুযোগ আজন্ম সুযোগসন্ধানী মাওবাদীরা নেবে না তো কারা নেবে? প্রশ্নটা অস্বস্তি তৈরি করছেই— হার্মাদ গেল, ভৈরব এল। কিন্তু উলুখাগড়াদের প্রাণসংশয়ে ভাটা পড়লো কি? প্রশ্নটা সহজ। উত্তরও জানা— মাও বাড়-বাড়ন্ত যথা পূর্বং তথা পরং। সুতরাং জীবন সংগ্রামে প্রাণসংশয় সুগভীর।

চিঠিপত্র

দুর্বল ধনঞ্জয় বনাম সবল আফজলগুরু ও মহম্মদ কাসভ

কামান্ধ যুবক ধনঞ্জয় একটি যুবতীকে ধর্ষণের পর প্রাণভয়ে তাকে হত্যা করেছিল। হত্যা তার উদ্দেশ্য ছিল না। এটা অপরাধই। আইনানুযায়ী তার ফাঁসি হয়েছে। সরকার প্রশংসনীয় তৎপরতায় কাজটি সম্পন্ন করেছিল। পক্ষান্তরে সহস্রগুণে বেশি অপরাধ করেছে আফজল গুরু ও পাকিস্তানী মহম্মদ কাসভ। পরিকল্পনা করে ভারতকে দুর্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত করতে তারা যথাক্রমে ভারতের সংসদভবন ও মুম্বই-এর তাজ হোটেল আক্রমণ করে পুলিশসহ বহু নিরীহ লোককে হত্যা ও দেশের প্রচুর সম্পদ ধ্বংস করেছে। নরহত্যা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। এনিয়ে কোনও অভিযোগ বা প্রশ্ন নেই। কিন্তু কয়েক বছর চলে গেল অথচ ফাঁসি কার্যকর না করে তাদের লালন-পালন করা হচ্ছে কেন দেশবাসী এই রহস্য জানতে চান। এটা তাদের অধিকার। সন্দেহ হয় ভারত সরকার কি তথাকথিত সংখ্যালঘুদের অসন্তোষের ভয়ে এরূপ গড়িমসি করছে? এতগুলি লোকের প্রাণ, দেশের সম্পদ ও আইনের বিধান-কে বর্তমান সরকার তুচ্ছ জ্ঞান করেই এসব করছে কিনা তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

সব শিয়ালের এক রা

গত ২৮ আগস্ট ছাত্র-পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি করতে বলেছেন। আবার ছাত্রদের সামনে খুড়োর কল ঝুলিয়ে ছাত্রদের গ্রামে গিয়ে তৃণমূলের নীতি প্রচার ও প্রসার করতেও বলেছেন। যারা এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে তাদের চাকরি পাওয়া সহজ হবে বলে মন্তব্য করেছেন। সিপিএম ৩৪ বছর ধরে যে কাজ করে তাদের রাজত্ব বজায় রেখেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই পথ ধরেই কী হাঁটতে চাইছেন? ডি ওয়াই এফ আই, এস এফ আই ক্যাডাররাই যে সিপিএম-এর আসল শক্তি সেটা তো সকলেরই জানা আর সব সরকারি কাজেই এদের থেকে কর্মচারী নেওয়া হোত। কো-অর্ডিনেশন কমিটি সরকারী কর্মচারীদের উপর ছড়ি ঘোরাত, তাদের জোরে এতদিন সিপিএম লালবাড়ি দখলে রেখেছিল। Unlucky thirteen-এতে (২০১৩) পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল যতটা সফল হবে ততটা-ই লালবাড়ির দখল সুনিশ্চিত হবে। খুড়োর কল-এ ছাত্রসমাজ প্রভাবিত হবে বলে মনে হচ্ছে না।

১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম খুড়োর কল ঝুলিয়ে রাজত্ব করে এসেছিল। প্রথমের দিকে পার্টির জোরে চাকরি হলেও ২০০০-এর পর থেকে সেটা ততটা কার্যকর হয়নি। তাই এখনকার ছাত্রসমাজের মনে এই ভাঁওতা দাগ কাটবে কিনা সন্দেহ।

—পিয়ালী ঘোষ, গড়বেতা, মেদিনীপুর।

বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের বাজনা

বিসর্জনের বাজনা, দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতির বিসর্জন। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত টাকীতে শারদীয়া দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা ভাসান উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা মধ্যবর্তী ইছামতী নদীতে সাম্প্রতিক বেশ কয়েক বছর ধরে 'আড়ম্বরের সঙ্গে দুই পারের মিলন' অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ এই দুই দেশের মানুষদের শুভ বিজয়ার পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় অবাধ আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে হয়ে আসছে। সংবাদ- মাধ্যমের দৌলতে তা রাজ্যে দিনকে দিন আকর্ষণের শৈল্পিক প্রকরণে উচ্চগ্রাম মাত্রায় এক অসাধারণ কেন্দ্রবিন্দুতে জনমনে ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছে।

কিন্তু প্রচারের আলোক-কল্পারম্ভের অন্তরালে অন্য 'নঞর্থক' কিছু ঘটে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম, পুলিশ-প্রশাসন, বি এস এফ সম্পূর্ণ নির্বিকার। সীমান্ত 'হাট' করে খুলে দেওয়ায় অবাধ পারাপারের সুযোগে এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত। টাকী পৌরসভার পৌরবাসীগণের বিজয়ার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায় অবাধ অনুপ্রবেশের ঢল নামায়। রাস্তা-ঘাটে চলাই দায়। বৈধ টিকিট কেটেও ট্রেনে ওঠা যায় না লক্ষাধিক অনুপ্রবেশের কারণে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে এবং প্রতিটি বিস্ফোরণের পর আরও 'গোয়েন্দা সতর্কতা', 'সীমান্ত সুরক্ষা' প্রভৃতি ভারী ভারী শব্দের কড়া দাওয়াইয়ের কথা যেভাবে সরকারের তরফ হতে বলা হয় তা শুনতে শুনতে দেশবাসীর কান পচে গেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও দুঃখের কথা এই যে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বি এস এফ, পুলিশ-প্রশাসন সব ওপরওয়ালার প্রতি দায় চাপিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

এদিকে সংবাদ-মাধ্যমের মিষ্টি কথায় সীমান্তবাসী তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বদেশপ্রেমী নাগরিকগণ ব্যতীত অন্যত্র এ রাজ্যবাসীবৃন্দ চমৎকৃত। দেশবিরোধীরা এরকম সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবে। দেশের যে-কোনও স্থানে বোমা-বিস্ফোরণ হলে পশ্চিমবঙ্গের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশস্থিত জঙ্গিরাও সে-কাজে জড়িত। তাদের আসা-যাওয়া এমনিতেই অবাধে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পারাপার। আর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো 'দুই পারের মিলন', 'দুই পারের বাংলার মিলন' 'দুই দেশের মিলন' এরকম মিষ্টিমধুর কথার আড়ালে কাদের স্বার্থ-পূরণ হচ্ছে, স্থির মস্তিষ্কে একটু চিন্তা করলেই তা সহজেই অনুমেয়।

ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য— অতিরিক্ত বৃষ্টিতে দু'কূল ছাপাবে, বন্যা হবে— সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে জনপ্লাবন হলে পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে অবশ্যই গমন করবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। কোনও সীমানা, রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। তাই ভারতে অনুপ্রবেশ, ঢাকার বিচারে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই সাধু সাবধান। দুই বাংলা নিয়ে আরেকটা মোঘলস্থানের আঁক এভাবেই কষা হচ্ছে। তাই আসুন নিজ কৃষ্টি, নিজ সংস্কৃতি রক্ষা করতে ও আশু বিপদ হতে নিজেদের উদ্ধার পেতে স্বধর্মনিষ্ঠ হই— স্বদেশপ্রেমী মানুষের এটাই পরম কর্তব্য।

—রঞ্জন ভুঁইয়া, কলকাতা-৭০০০০৬।

সংস্কৃত কলেজ

'সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত এত অবহেলিত কেন' (২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১) শীর্ষক বিশেষ নিবন্ধ প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমগুলির সংবাদ

পরিবেশন, সংবাদ ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ এবং সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতার প্রবাসী বিদ্বজ্জনসান্নিধ্যের ছবি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য অপেক্ষা রাখে না যে এই উপমহাদেশের উচ্চশিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান প্রেসিডেন্সি কলেজ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে কলকাতার সংস্কৃত কলেজও একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাংলার নবজাগরণের অনেক নেতাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত এই কলেজের হাল আজ সত্যিই শোচনীয়। সংকীর্ণ রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত কলেজ আজ নিতান্তই অবহেলার সামগ্রী। এইজন্য বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত ভারতীয় ভাষার মাতৃস্বরূপা সংস্কৃতকে 'ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ' তকমা দিয়ে পাঠ্যসূচি থেকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষায়, বিশেষ করে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পড়ুয়াদের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর এই সংস্কৃত ভাষার পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজ। তাই সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে সংস্কৃত ভাষার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা হোক।

—অনু বর্মণ, মদনপুর, নদীয়া।

ইমামের হুমকি

সংবাদপত্রে দেখলাম যে ইমাম ফজলুর রহমান পশ্চিমবঙ্গের বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে হুমকি দিয়েছেন যে সংখ্যালঘু (পড়ুন মুসলিম) সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করতে পারলে তাঁকে চলে যেতে হবে। কি সাংঘাতিক কথা এই সুষ্ঠু সমাধান বলতে কি বোঝায় তা ওই ইমাম সাহেব না বললেও তা যে পশ্চিমবাংলাকে সামগ্রিক ইসলামিকরণ করা বুঝায়, সে কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ, পৃথক সংখ্যালঘু দপ্তর, সংখ্যালঘু সেল, অজস্র মাদ্রাসা তৈরি ও তার সরকারি স্বীকৃতি, একাধিক মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, একাধিক হজ হাউস নির্মাণ, হজে ভর্তুকি, সভারম্ভে ও পরে ''খোদা হাফেজ'', ''ইনসাল্লা'' ''সালাম'', ঘন ঘন ইফতিয়ার পার্টি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি মুসলমান বেশে প্রকাশ্য রাস্তায় ঈদের নামাজ পড়েও মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না! তিনি যদি দেশবিভাগের বলি বাংলার হতভাগ্য হিন্দুদের বঞ্চিত করে সব চাকুরী মুসলমানদের দিয়ে দেনও তবুও তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। নিত্য নতুন সাম্প্রদায়িক দাবী উঠতেই থাকবে যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম গত চল্লিশের দশকে।

তাই বলছি এখন-ই এই সব সাম্প্রদায়িক দাবী সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার ও তার রাশ টানার সময় এসেছে।

—সুহাস বসু, কলকাতা-৬০।

মহাপ্রাণ যোগেন মণ্ডল

সম্প্রতি কলকাতার এক বাংলা দৈনিকে সত্যেন সুতারের লেখা 'মহাপ্রাণ যোগেন মণ্ডল' পত্রের উত্তরে এই পত্রের অবতারণা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ যোগেনবাবুকে হিন্দুদের সর্বনাশের শনি ঠাকুর এবং মুসলিম লীগের সদস্য বলায় সত্যেনবাবু উষ্মা প্রকাশ করেছেন। সত্যেনবাবু এবং এই পত্রিকার বিদগ্ধ পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে'-তে লীগ গড়ের মাঠে যে জনসভা করে তাতে যোগেনবাবু ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বসেছিলেন, এবং পাকিস্তানের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

শ্রীহট্টে গণভোটের আগে ঢাকা শহরে ভিক্টোরিয়া পার্কে মুসলিম লীগ যে জনসভার আয়োজন করে তার প্রধান বক্তা ছিলেন যোগেনবাবু। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন দলিত এবং মুসলিমরা চিরদিনই বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত এবং শোষিত। অতএব তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সিলেটবাসী প্রত্যেক দলিত ভাইবোন যেন সিলেট-এর পাকিস্তান-ভুক্তির পক্ষে ভোট দেন। এহেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক সময় আবেগ প্রবণ হয়ে তিনি সংজ্ঞাহীন (সজাগ?) হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগ কর্মীরা তাঁর মাথায় জল ঢেলে, নিজেদের গায়ের জামা খুলে, তা দিয়ে তাঁর মাথা মুছিয়ে দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। ওই জনসভায় আমি স্টেজের সামনে বসে এই দৃশ্য অবলোকন করি। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি সেখানকার আইনমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু দেশ ভাগের পরদিন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) মুসলমানরা জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে।

১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে যখন হিন্দু নিধন আরম্ভ হয় তখন যোগেনবাবু বরিশাল গিয়ে কি দেখলেন তা তাঁর পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ করেছেন— এক এক জায়গায় ২৫০/৩০০ পচাগলা মৃতদেহ, অসংখ্য নারী ধর্ষিতা এবং অপহৃতা, এর ৯০ শতাংশই তার স্বজাতি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। বরিশাল থেকে ঢাকা এসে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিচার না পেয়ে করাচী ফিরে গিয়ে উজিরে আজম লিয়াকৎ আলি খানকে অভিযোগ জানালেন। সব শুনে লিয়াকৎ মিঁয়া বললেন বেশী কথা বললে এক্ষুনি জেলে পুরে দেওয়া হবে। যোগেনবাবু বেশী কথা না বাড়িয়ে রিক্সাযোগে ঢাকা হয়ে কলকাতা এসে ৮-১০-১৯৫০ তারিখে তাঁর পদত্যাগপত্র করাচীতে পাঠিয়ে দেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গাপীড়িত কিছু নমঃশূদ্র যুবক যখন যোগেনবাবুকে তাঁর কলকাতা বাড়িতে আক্রমণ করে তখন পাড়ার বর্ণ হিন্দুরাই তাঁর জীবন রক্ষা করেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নেকড়ের মুখে ফেলে এসে মনুবাদী ভারতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানে রেখে এসেছেন তার নামাঙ্কিত পোড়া মাটির ইট, লীগ নেতা সিরাজ মিঁয়ার সঙ্গে যৌথ ঠিকাদারি। ইঁটের ভাটা চৌমুহানী (নোয়াখালী) লোকলক্ষ্মীপুর পর্যন্ত কংক্রিট এর রাস্তা খুঁড়লে এখনও পাওয়া যাবে যোগেন্দ্র-সিরাজ ইঁট।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

আদি গ্রন্থ গ্রন্থ-সাহিব

পরম্পরা

নির্মল কর

'গ্রন্থ সাহিব' শিখধর্মের নিছক একটি পবিত্র ধর্মপুস্তকই নয়, ক্রমাগত পরিমার্জিত হওয়া এটি তাঁদের আদি ও একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। কোনও ধর্মগুরুর চেয়ে এই গ্রন্থের মর্যাদা অনুগামীদের কাছে অপরিসীম।

মহাকাব্যের মতো ধর্মগ্রন্থও দু'ধরনের। এক ধরনের ধর্মগ্রন্থ গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায়, নানাজনের করস্পর্শে। আর এক ধরনের

ধর্মগ্রন্থ আধুনিককালের বিষয় এবং তা সংকলন-জাতীয় বই--- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সার-সংকলন থাকে এতে। শিখদের 'গ্রন্থ সাহিব' এই দ্বিতীয় প্রকারের ধর্মগ্রন্থ। 'শিখধর্ম' আধুনিক যুগের সৃষ্টি। এই ধর্মের প্রবর্তক ধর্মগুরু নানক। কিন্তু গ্রন্থসাহিবের সংকলন কর্তা মূলত পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব, যাঁর কার্যকাল ১৫৮২—১৬০৭ খৃস্টাব্দ। অনেকে হয়তো জানেন না, ভারতবর্ষের নানা ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রন্থ সাহিবের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। শিখধর্মও নানা ধর্ম- বিশ্বাসের সম্মিলিত স্বরূপ। এর দর্শনে হিন্দুভাবই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। গ্রন্থ সাহিব-এর রচয়িতা হিসেবে ছত্রিশ জনের নাম করা যায়। এঁদের মধ্যে সাতজন হলেন শিখগুরু। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরু কিছুই করেননি আর দশম গুরু লিখেছিলেন শুধু এক লাইন। সাতজন গুরু বাদে চৌদ্দজন সাধুর রচনা আছে এতে। এঁদের মধ্যে ফরিদ ছিলেন মুসলমান। কবীর মুসলমান হয়েও ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন হিন্দু। জয়দেব, ত্রিলোচন, সুরদাস ও রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ। পিপা ছিলেন জনৈক রাজা। ভিকম ও বেণী কোন্ সম্প্রদায়ের তা জানা যায় না। ধন্না ছিলেন জাঠ আর বাকি চারজন ছিলেন শূদ্র— নামদেব (তন্তুবায়), সাঁই (নাপিত), সাদন (কশাই) ও রবিদাস (চর্মকার)। আর আছে পনেরো জন ভাটের রচনা। এঁরা সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ।

আদি গ্রন্থের প্রথম বইটি সংকলিত হয় পাণ্ডুলিপি আকারে। পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে কর্তারপুরের সোধিদের কাছে। গ্রন্থসাহিব সেই সময়ে প্রচারিত প্রায় সব আর্যভাষার মিশ্রিত সংকলন। মুখ্য অংশ জুড়ে তৎকালীন হিন্দি ভাষা। কিন্তু সমস্ত সংকলনের প্রবণতাটি হিন্দুধর্মের। এর অলংকার, আখ্যান ভাগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যত উপনিষদ আর বেদান্ত দর্শন থেকে। এটি একটি বহু ভাষার সংকলন।

শিখ ধর্মের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের নির্দেশ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর পর আর কোনও গুরু আসবেন না। ধর্মীয় ব্যাপারে শিখ সমাজ অতঃপর চালিত হবে 'গ্রন্থসাহিব' দ্বারা। তাই গ্রন্থসাহিব-ই দিশারী। এর আগেই অবশ্য গুরু অর্জুন দেব চার শতাধিক বছর আগে ১৬০৪ সালে স্বর্ণমন্দিরে গ্রন্থসাহিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন। গ্রন্থসাহিবকে যেভাবে অনুষ্ঠানিকভাবে শিখ সম্প্রদায়ের গুরুর মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তা একেবারেই অনন্য। এর তুলনা নেই কোনও ধর্মেই।

গ্রন্থ সাহিব-এর অনধিক দেড় হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে ৫৮৯৪টি স্তোত্র, যার মধ্যে গুরু নানকের রচনা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অন্যান্য গুরুদের রচনাও। এমনকী কবীর, নামদেব ও রবিদাসের মতো শিখধর্ম বা খালসা পন্থের বাইরে থাকা ধর্মীয় ব্যক্তিদের রচিত স্তবগাথাও। নানকের ধর্ম যে ভক্তিবাদের অংশ হিসেবেই বিকশিত হয়েছিল, ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের অংশ হিসেবে নয়, তা এই স্তোত্রগুলোতে স্পষ্ট। আরও স্পষ্ট এই ধর্মের ওপর সুফি ইসলামের ব্যাপক প্রভাব বস্তুত যা সমগ্র ভক্তি আন্দোলনকেই একদা প্লাবিত করেছিল। পরবর্তী ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস যে, একদিকে হিন্দুস্তানের মুসলমান রাজশক্তি, অন্যদিকে ইরান ও আফগানিস্তান থেকে ধেয়ে-আসা নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির মতো মুসলমান আগ্রাসনকারীদের সঙ্গে শিখদের ধুন্ধুমার সংগ্রাম পাঞ্জাবের মাটিকে রক্তাক্ত করে তোলে এবং সমগ্র শিখ পন্থেরই সামরিকীকরণ ঘটায়। একদিকে এই ধর্ম পুরোহিততন্ত্র, ঔপচারিকতা ও যাগযজ্ঞের বিড়ম্বনা এবং জাতপাতের ভেদবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল, অন্যদিকে অতিক্রম করে ধর্মীয় বিভেদকে। খালসা পন্থের জঙ্গিয়ানা আরও পরবর্তীতে খালিস্তানের কল্পরাষ্ট্রকে ঘিরে জাগ্রত হয়। পাঞ্জাব তথা সমগ্র দেশের পক্ষে তার বিস্ময়কর পরিণাম উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের উপজীব্য।

শিখরা হিন্দু-সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ তার প্রমাণ যে কোনও হিন্দু গুরুর মতোই মন্দিরের প্রধান পূজারী পণ্ডিত বেদব্যাসের বক্তব্য : সনাতন ধর্ম যখন আক্রান্ত হয়, তখন দেশের চার প্রান্তে চার জন সাধক এগিয়ে আসেন। এঁরা হলেন গুরু নানক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, নামদেবজি ও বল্লভাচার্য। এঁরা সবাই ভগবানের অংশ ছিলেন। 'গ্রন্থ সাহিব' সম্পর্কে বেদব্যাসের মনোভাব হলো 'যেখানে ভগবান স্বয়ং আমাদের মন্দিরে উপস্থিত, তখন গুরুর কী প্রয়োজন? আমাদের মন্দিরে তো বিগ্রহরূপী ভগবানই থাকেন।"

শিখদের আর এক সম্প্রদায় নিরঙ্কারিরা 'গ্রন্থ সাহিব'কে গুরু বলে মানেন না। কারণ, খালিস্তান দাবি তোলার প্রাক লগ্নে জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালেরও মূল লক্ষ্য ছিলেন নিরঙ্কারি বা নামধারীদের মতো শিখদের অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়। তৎকালীন নিরঙ্কারি গুরুকে হত্যাও করেছিল শিখ সন্ত্রাসবাদীরা। নিরঙ্কারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত শহীদদের রক্তাক্ত ছবিও আছে স্বর্ণমন্দিরের মিউজিয়ামে। তাঁরা সবাই ছিলেন ভিন্দ্রানওয়ালের অনুগামী।

এই অবস্থায় অমৃতসরে ২০০৪ সালে আদি গ্রন্থের যে-চারশো বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল নেহাতই শিখদের সব থেকে বড় সম্প্রদায়ের উৎসব। অথচ গুরু নানকের ধর্ম তো ভক্তির ধর্ম, সকলকে মিলিত করার ধর্ম। গুরু গ্রন্থ ছত্রে ছত্রে বলেছে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে সৎ জীবনের জন্য প্রয়াসী হতে হবে। সৎ ও স্বচ্ছ জীবন, ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ের কথা গ্রন্থ সাহিব-এ থাকলেও বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন কোথায়? অকালি-নিরঙ্কারি দ্বন্দ্বে নানকের ভক্তিবাদ থেকে শিখধর্ম দূরে চলে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাওয়া হেরিটেজগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন

ড. প্রণব রায়

নদী-নালায় ভরা পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায় অজস্র মঠ, মন্দির-মসজিদ, পুরানো বাড়িঘর, ভগ্ন গড় ও দুর্গ আমাদের প্রাচীন বাংলার গৌরবময় যুগের বাহক। ইংরেজরা এদেশের আধিপত্য লাভের পর তাদের কেউ কেউ এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদের সংরক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। লর্ড কার্জনের 'হেরিটেজ' বা পুরাকীর্তিগুলির প্রতি আকর্ষণ সুবিদিত ছিল। তিনি কোণারকের মন্দির রক্ষা করেন, তা না হলে আজ আমরা সেই মন্দির দেখতে পেতাম না। জন মার্শাল, কানিংহাম প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ 'হেরিটেজ'গুলির প্রতি যত্নবান ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ' বিভাগ ভারত তথা পশ্চিমবাংলার হেরিটেজ বা ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন নির্দশনগুলির কিছু কিছু সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়াসী হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের অপূর্ব 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলিকে তারা সুন্দরভাবে সংরক্ষিতও করেছে।

এইসব ঐতিহ্যপূর্ণ পুরাবস্তুগুলির সংরক্ষণ করা শুধুমাত্র ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এক বিশেষ দায়িত্ব। সরকারের পুরাতত্ত্ব দপ্তর আছে। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন। কিন্তু তারা তেমন কিছু দায়িত্ব পালন করে না। হেরিটেজগুলি রক্ষা করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'হেরিটেজ কমিশন' আছে। সেখানে মনোনীত সভাপতি ছাড়া, বেতনভুক সচিব এবং কমিশন-কার্যালয়ের বেতনভুক কর্মচারীবৃন্দ ও হেরিটেজ কমিটির সরকারি মনোনীত কয়েকজন সদস্যও আছেন। পূর্বতন কমিটিতে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের মনোনীত দলীয় সদস্যরা ছিলেন। তাঁদের প্রায় সকলেই কলকাতাবাসী এবং বিদেশ গমন ও সেমিনারে আগ্রহী ছিলেন, পশ্চিমবাংলার 'হেরিটেজ'-এ কি তেমন আগ্রহ ছিল?

পশ্চিমবাংলায় যে অসংখ্য 'হেরিটেজ' বা প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ পুরাকীর্তিগুলি গ্রাম-বাংলার অসংখ্য স্থানে, দুর্গম গ্রামাঞ্চলে বর্তমান, অবহেলা-অনাদরে যেগুলি ধ্বংসের পথে, সেসবের কোনও ধারণা এইসব কলকাতাবাসী সৌখিন 'দলের বশংবদ' কমিটি-সদস্যদের তথা তদানীন্তন সভাপতিরও ছিল না। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে, ধ্বংসপ্রায় পুরাকীর্তিগুলির বেশ কিছু একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথজীউর দেওয়ালের একটি অংশ।

পূর্বতন 'হেরিটেজ কমিশনে'র একজন সভাপতি ছিলেন, তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম, ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। তিনি আমাদের 'হেরিটেজ-গুলির দূরবস্থার কথা চিন্তা করে শুধুমাত্র সৌখিন তথাকথিত 'নামজাদা' কমিটির সদস্যদের ওপর নির্ভর না করে জেলাভিত্তিক 'হেরিটেজ কমিটি' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হেরিটেজ রক্ষার জন্য এটা ছিল তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কয়েকটি জেলার 'হেরিটেজ কমিটি' গঠিত হয়। আমি বিশেষভাবে জানি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জন্য দুটি 'হেরিটেজ কমিটি' হয় এবং দুটি জেলার একনিষ্ঠ নীরব গবেষকগণ এই কমিটির সদস্য মনোনীত হন। 'হেরিটেজ কমিশন' থেকে তাঁদের চিঠিও দেওয়া হয়। এর প্রমাণ আছে। অন্যান্য জেলাতে কমিটি গঠন ও সদস্য মনোনয়নের প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক এই সময়েই সভাপতি ড. চন্দ্রের মৃত্যু হয়। এরপর যিনি আসেন (সভাপতিরূপে), তিনি স্বাভাবিকভাবেই দল মনোনীত, সন্দেহ নেই। তিনি নবগঠিত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুটি কমিটিকে বাতিল না করে নিষ্ক্রিয় করে রেখে দেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না করে দলীয় সদস্যদের নিয়ে কাজ চালাতে থাকেন। তাঁর আমলে বিশেষ কোনও 'হেরিটেজ' সংরক্ষণ হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু তাঁর পূর্বতন সভাপতির আমলে জানা যায়, সংরক্ষণের কাজ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে ছিল। উত্তর চব্বিশ পরগণার ঐতিহাসিক 'চৈতন্য ডোবা' আশ্রমের সংরক্ষণ তার মধ্যে অন্যতম। বহু মন্দিরও সংরক্ষণের আওতায় ছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুটি 'হেরিটেজ' কমিটির মনোনীত 'আহ্বায়ক', জেলা কমিটির সদস্যগণকে নিয়ে সভা আদৌ করতে পারেননি, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের পরবর্তী সভাপতির কোনওরূপ সহায়তা না পেয়ে। দুই মেদিনীপুর জেলায় যে অসংখ্য 'হেরিটেজ' আছে, সেগুলি কমিটির (দুই জেলার) সদস্যদের নখদর্পণে ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত,

লেখক ও গবেষক। কমিশনের সদস্যদের থেকেও তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন বলে জানা গেছে। কিন্তু তৎকালীন কমিটির সভাপতি ও কোনও কোনও সদস্যের মতে তাঁরা হয়তো যোগ্য নন, কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ, দলতন্ত্রে বিশ্বাসী নন এবং 'ধান্দাবাজি' ও 'দলবাজি'তে অভিজ্ঞতাসম্পন্নও নন! সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাতে সিপিএম ও তার 'শাকরেদ'রা যেমন দলীয় লোকদের বিপুল সংখ্যায় ঢুকিয়ে দিয়ে 'দলতন্ত্র' কায়েম করে রেখেছে, 'হেরিটেজ কমিশন'ও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

কমিটির তৎকালীন এক প্রভাবশালী 'দলীয়' সদস্যের সঙ্গে বর্তমান লেখকের কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে একবার কথাপ্রসঙ্গে সেই কমিশনের সদস্য বলেছিলেন, 'মেদিনীপুরের ওইসব সদস্য আর কি কাজ করবেন?' খুবই আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কারের সঙ্গে কথা। সেই কমিশনের প্রায় সব সদস্যই ছিলেন অত্যন্ত অহঙ্কারী, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর 'কেউ' নেই, এটাই ছিল সম্ভবত তাঁদের ধারণা। কিন্তু আমার প্রশ্ন, মেদিনীপুরের ক'টা 'হেরিটেজ' তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন বা রক্ষা করেছেন? আমি দুটিমাত্র উদাহরণ এখানে উপস্থাপিত করব, যেগুলি খুবই প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা শহর খুবই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত।

চন্দ্রকোণা শহরের 'অযোধ্যা'পল্লীর 'রঘুনাথবাড়ি' কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ও গৃহে পূর্ণ ছিল। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে অবহেলা-অনাদরে পরিত্যক্ত ছিল। 'বর্তমান' পত্রিকায় বেশ কয়েক বছর আগে একটি পত্রে এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। এই পত্রিকার 'চিঠিপত্র বিভাগে' (সম্ভবত ১৯৮৫ সালে) সেটি একটি সুন্দর স্কেচসহ প্রকাশিত হয়, তার মাত্র একদিন পরে মহাকরণের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক আধিকারিকের কাছে 'বর্তমান' পত্রিকার সেই কাটিং দেখি। দীর্ঘ টালবাহানার পর আমার রচিত 'মেদিনীপুর জেলার 'প্রত্নসম্পদ' (১৯৮৬) তখন প্রকাশের পথে। ওই কাটিং তাঁর টেবিলে দেখে তাঁকে 'রঘুনাথবাড়ি' রক্ষার আবেদন জানাই।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা শহরের রঘুনাথবাড়ির অযোধ্যায় ভগ্ন মন্দির।

দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপরও আরও কয়েকবার চন্দ্রকোণায় যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথজীউ, লালজীউর সুদৃশ্য প্রাচীন 'দেউল' ও 'আটচালা' মন্দির ভেঙে পড়ছে, লক্ষ্য করি। কয়েকটি সংবাদপত্রে লেখালেখি করেও কিছু হয়নি। স্থানীয় পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কিছু হয়নি। ২০০১-এ খুব শোচনীয় অবস্থায় দেখেছিলাম। ২০০৭-এ দেখলাম লালজীউর বৃহৎ সুপ্রাচীন 'আটচালা' মন্দির একেবারে ভেঙে ভুলুণ্ঠিত এবং রঘুনাথজীউর সুদৃশ্য দেউল-এর প্রায় সবটাই ভেঙে পড়েছে। নাটমন্দির অনেক কাল আগেই ভগ্ন। অন্যান্য মন্দির— যেগুলি 'হেরিটেজ'র অনন্য নিদর্শন, সেগুলিও ধ্বংসের পথে। একটি প্রাচীন কামান মন্দির চত্বরে ছিল, সেটি দীর্ঘকাল আগে অপসারিত। দ্বিতীয় নিদর্শনটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার রাধানগর গ্রামের বহুকাল পরিত্যক্ত গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। ১৭১৮ সালে নির্মিত। সংস্কৃতলিপি পাথরে খোদিত। এখনও আছে। মন্দিরের সামনের ও পূব দিকের দেওয়ালে বহুকাল ধরে ফাটল ধরে আছে, গাছগাছালিতে বহুকাল পূর্ব। মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন— ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড পাকা রাস্তার পাশে পাথরের এই সুন্দর মন্দিরটি থাকলেও 'হেরিটেজ কমিশন' অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব দপ্তরের এটির প্রতি দৃষ্টি পড়েনি। পুরাতত্ত্ব দপ্তর তখন বেশির ভাগই দলীয় লোকে পূর্ণ। রাধানগরের এই অপূর্ব মন্দিরটির শীঘ্র ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। এটি বিধ্বস্ত হলে আমাদের একটি অনন্য পুরাকীর্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বিদেশী কোনও কোনও গবেষক আমাদের দেশের এই হেরিটেজগুলিকে কত আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন, তার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ডেভিড্ ম্যাক্কাচ্চন। বহুকাল আগে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি গত হয়েছেন (১৯৭২ সাল)। লক্ষ্য করা গেছে, তিনি মন্দির ও টেরাকোটার যখন ছবি তুলতেন, তখন তাঁর কাছে 'ট্রিকিলার' ওষুধ থাকত। সেটি গাছের বা আগাছার গোড়ায় তিনি ঢেলে দিতেন এবং মন্দির-দেওয়ালের বহু স্থান 'ব্রাশ' দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন। এতে অনেক গাছ মরে গিয়ে প্রাচীন এই কীর্তিগুলি রক্ষা পেয়েছিল। পূর্বতন হেরিটেজ কমিটির বহু সদস্য শুধু কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন ও ভাতা গ্রহণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। তাহলে এই ধরনের বহু হেরিটেজের এমন দৈন্যদশা হোত না। প্রতিটি জেলায় ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কথামতো যদি নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ কমিটির সদস্য মনোনীত করা হোত, তাহলে এই অবস্থার এতটা করুণ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করা যেত না।

অথচ হেরিটেজগুলির সংরক্ষণের জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হয়। দাসপুর থানার নাড়াজোলের রাজবাড়ি এলাকার 'চাঁপাবাগানে'র একটি প্রাচীন বাড়ির জন্যে নাকি ৮৪ লক্ষ টাকা এক দলীয় ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস আগে সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কাজ কিছুই হয়নি। আধিকারিকদের কয়েকটি গাড়ি সেখানে আছে দেখা গেল। কলকাতা থেকে তাঁরা এসেছেন। আবার ফিরে যাবেন। বালি- সিমেন্টের প্রলেপ এত-ই নিম্নমানের ছিল যে, হাত দিয়ে একটু ঘষলেই তা খসে যাচ্ছিল।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেরও মন্ত্রী। তিনি ও হেরিটেজ কমিশনের নূতন সভাপতি এসবের বিহিত করবেন আশা করা যায়।

গরীব ঘরের শিশু, আবার বাঁচারও শখ!

হে নবজাতক,

তোমাকে স্বাগত জানাতে লজ্জা করছে। না, একগুচ্ছ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মাতে হবে বলে নয়, আসলে জন্মানোর পর মুহূর্তেই তোমার অসুস্থতা সারিয়ে তোমায় জীবন দিতে পারি না বলে। ২০১১ সালেও এই ব্যর্থতা লজ্জা দেয়। আরও লজ্জা দেয় সেই মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলতে।

এবারের চিঠিটা এভাবেই লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সদ্যোজাতকে এত ভারী ভারী কথা না বলে চিঠির ঠিকানা বদলে দেওয়াই ভালো।

প্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ম্যাডাম দিদি, জানি আপনি মুখ্যমন্ত্রী তবু আপনাকে আজ ওই নামেই ডাকতে ইচ্ছে করছে। আপনি তখন বাড়ির কালীপুজো নিয়ে ব্যস্ত। টিভিতে দেখছি এই আপনি পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন তো এই দধিকর্মা মাখছেন, প্রসাদ বিলি করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতার মেয়র আপনার আদরের কানন কাঁসি বাজাচ্ছেন। আর ঠিক তখনই কলকাতার এক হাসপাতালে একের পর এক শিশু মারা যাচ্ছে। তারা সকলেই নবজাতক। কারও বয়স দু'দিন তো কারও আট দিন। আর তা নিয়ে চলছে শোরগোল। টিভিতে দেখলাম সন্তান হারানো মায়ের অঝোর কান্না।

আপনি নিশ্চয়ই তখন, কালী পুজোর ঢাক, মাইক, বাজি ও স্তুতির মাঝে সে কান্না শুনতে পাননি। না পাওয়াই ভালো। শুভ মুহূর্তে অমন অশুভ কান্নায় চোখ এবং কান না দেওয়াই ভালো।

আপনার স্বাস্থ্য দফতর অবশ্য বসে থাকেনি। বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালে ৪৮ ঘণ্টায় ১৮ শিশুর মৃত্যু নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। সেই কমিটিও দুরন্ত গতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত সেরে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বলেছে মৃত্যুর এই সংখ্যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। রিপোর্ট পেয়ে খুশিও হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। বলা হয়েছে, শিশু মৃত্যুতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নেই। কোনও রকম চিকিৎসার গাফিলতিও ছিল না। সেজন্য নতুন করে কোনও তদন্ত করবে না স্বাস্থ্য দফতর।

কিন্তু কারও যখন গাফিলতি নেই তবে ওই শিশুদের মৃত্যু হলো কেন? ওদের জন্ম নেওয়াতেই গাফিলতি ছিল? অনেকটা তেমন দাবিও করেছেন তদন্তকারীরা। তাদের দাবি, অনেক শিশুই জন্মের আগে থেকে মাতৃগর্ভেই অসুস্থ ছিল। তাছাড়া এদের বড় অপরাধ এরা গরীব ঘরের মায়ের গর্ভজাত। যে মা প্রসূতি থাকা সময়ে সেভাবে পুষ্টিকর খাবার খাননি। তাছাড়াও একটা বড় অপরাধ আছে। সেটা হলো এই বাংলার এমন জায়গায় এরা জন্মেছে যেখানে ভালো চিকিৎসার সুযোগ নেই। তাই অনেক পথ পাড়ি দিয়ে অনেক খানাখন্দ পার করে অসুস্থ শরীরে কলকাতায় আসতে হয়। তাতে মৃত্যুটা আরও নিশ্চিত হয়ে যায়।

প্রতিটি যুক্তিই কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ওদের মৃত্যু নিয়ে আর যাই হোক সরকারের গাফিলতির কোনও প্রশ্ন থাকতেই পারে না।

রাগ করবেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাডাম, এই মাস ছয়েক আগে পর্যন্ত বাম সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন যতবার বি সি রায় হাসপাতালে এক সঙ্গে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছে প্রতিবারই সরকার এই কথাগুলিও বলত। আর আপনারা সেসব খণ্ডন করে পাল্টা প্রশ্ন তুলে অনেক রাজনীতি করেছেন। কিন্তু এখন আপনার বদলের সরকারে আপনার দফতরের মুখে সেই একই উত্তর দেখে মনে প্রশ্ন জাগে এই রাজ্যে আদৌ পরিবর্তন এসেছে কি?

দিদি, আপনার দফতরের কর্তারা এখানেই থামেননি। পুজোর মন্ত্রে যেমন সবার আগে 'ওঁ' উচ্চারণ করতে হয় তেমন আপনার মন্ত্রিসভার সবাই যে কোনও কথা বলার আগে বলে নেন 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে'। ঠিক তেমনটাই আজকাল আমলারাও শিখে নিয়েছেন। টিভিতে দেখলাম তদন্ত রিপোর্ট পেয়েই এক স্বাস্থ্যকর্তা বললেন, কয়েকমাস আগেই হাসপাতালের পরিকাঠামো বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো বি সি রায় হাসপাতালে একটি ৩০ শয্যার সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট খোলা হবে। কিছুটা সুস্থ শিশুদের জন্য থাকবে আরও ১০টি শয্যা। বাঙ্গুর হাসপাতালেও চালু হবে ৩০ শয্যার সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট। স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য, জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে পাঠানো সঙ্কটজনক অবস্থায় অনেক দূর থেকে আসা শিশুরই সাধারণত মৃত্যু হয় এখানে। তাই এরপর থেকে জেলা থেকে রেফার করা হলে তার কারণ জানাতে হবে বলেও নিয়ম চালু করতে চলেছে স্বাস্থ্য দফতর।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, দয়া করে জানাবেন কি, যে ঠিক কী কী কারণ জেলার হাসপাতালের চিকিৎসকরা রেফার করার সময় লিখবেন? তাঁরা লিখতে পারবেন যে, আমাদের সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামো নেই তাই পাঠানো হচ্ছে? তাঁরা কি লিখবেন যে, যে মায়েদের শিশু এরা তারা পরিবর্তনের বাংলাতেও পেট ভরে খেতে পায়নি? লিখবেন কি যে, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ থাকলেও সে সামর্থ্য নেই এই শিশুদের পরিবারের? তাই এদের অনেক ঝুঁকি নিয়েও কলকাতায় যেতে হবে?

মনে আছে, আপনি ক্ষমতায় বসার পরপরই এই বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে এমনভাবে একসঙ্গে অনেকগুলি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। সেবার আপনি ছুটে এসেছিলেন হাসপাতালে। ক'দিনের মধ্যেই পরিকাঠামো বদলে দেবেন বলেছিলেন। এটা হবে, সেটা হবে বলে অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। সত্যি বলছি ম্যাডাম, নিজে গিয়ে দেখে এসেছি এখনও একই দশা হাসপাতালের। আর অগতির গতি হিসেবে সেটাই মেনে নিতে হয় অসুস্থ শিশুর পরিবারকে।

বারবার যে কোনও অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আপনি বলেন, এমন বেহাল দশা করে রেখে গেছে আগের বাম সরকার। কিন্তুআপনি ক্ষমতায় আসার পর যারা ভূমিষ্ঠ হবে তারা কিন্তু বাম সরকারকে দেখেনি। তারা মা- মাটি-মানুষ সরকারেরই সন্তান। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি না ছুটিয়ে এবার একটু দেখুন না, যাতে নবজাতককে বাঁচার অধিকার দিতে পারে এই বাংলা।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

বিচ্ছেদ ও বিনাশ

সরিতা রাঠোর

হিন্দুশাস্ত্রে তালাক বা তথাকথিত 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' শব্দটি পাওয়া যায় না। এর সোজা সরল অর্থই হলো আমাদের সমাজে তালাক বা বিচ্ছেদের কোনও স্থানই নেই। (সকলের বোঝার সুবিধার জন্য 'তালাক' শব্দটিই এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।)

বিগত কয়েক বছর ধরে তালাক-এর এতসব ঘটনা সামনে আসছে যে, ভারতীয় জনসমাজ একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন— যে দেশে সীতা-সাবিত্রী, অনসূয়াদের মতো পতিব্রতাদের পরম্পরা রয়েছে সেখানে এত ব্যাপক পরিমাণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা কেন ঘটছে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট-ছোট ব্যাপারে এত মনান্তর হচ্ছে যে, মাসের পর মাস একছাদের তলায় বসবাস অথচ পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ। তারপর একদিন পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। এমনই শোনা যায়। তালাক বা বিচ্ছেদের পর স্বামী অথবা স্ত্রী— কে কতটা সুখী হন তা তাঁরাই ভালো বলতে পারেন। কিন্তু এটা বাস্তব যে, স্বামী-স্ত্রীর এই ঘটনায় ছেলেমেয়েরা খুবই মানসিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে— দুঃখী হয়। তারপর নাবালক ছেলে-মেয়ে মা'র সঙ্গে থাকবে না বাবার সঙ্গে থাকবে তা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে। এরফলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনাসহ অনেক কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়— বাধাপ্রাপ্ত হয়, চাপ পড়ে। কিছু স্বামী-স্ত্রী তো বিচ্ছেদের পরও খুবই অবসাদের মধ্যে থাকেন। কিন্তু অহং বোধের জন্য আর এক হয়ে মিলিত হতে পারেন না। জীবনটাই তাঁদের কাছে একরকম বোঝার মতো হয়ে দাঁড়ায়। জীবন নীরস ও নিরর্থক মনে হতে থাকে। দিল্লীর এক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সীমা বিবাহ-বিচ্ছিন্না জীবনযাপন করছেন। তাঁর নিজের কথায়, ''যদি বিবাহিত জীবন ঠিক থাকত তবে আমিও আজ মাতৃত্ব-সুখ আস্বাদন করতে পারতাম। বার বার পণের দাবি করার জন্য আমাদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এতে শাশুড়িরও বেশ ভালো ভূমিকা ছিল। এক সামাজিক সংস্থা—'নবজ্যোতি'-র কল্যাণে আমরা আবার একত্র জীবনযাপন শুরু করেছিলাম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কারণে আবার গোলমাল চালু হলো। ২০০৬-এ মামলা শুরু হলো। কিছুদিন আগে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আমাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকা নিয়ে কী করব? জীবনই তো শেষ। নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।''

আমার প্রতিবেশী রেণুবালার বিয়ে সম্প্রতি হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত এক বছরের মধ্যেই তার স্বামী মারা যায়। সে সময় তার গর্ভে সন্তান ছিল। স্বামী না থাকাতে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার শুরু হলো। পরিশ্রান্ত হয়ে হেরে গিয়ে কোলের শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে এল। তখন তার বয়স মাত্র ২০/২২ বছর। মা-বাবা খুব অস্বস্তিতে পড়ল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একজন পাত্র জুটল। তার সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু পাত্র নেশাগ্রস্ত। মদ

খেয়ে মারপিট রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। বেচারী আর কি করে? কিছুদিন বাদেই বাপের বাড়িতে চলে এল, আর বিচ্ছেদ নিয়ে নিল। তার জিজ্ঞাসা— 'এবার কী হবে? বিয়ে না করলে সমাজে বাঁচতে পারব না। আর বিয়ে করতে চাইলেও কোনও ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না'।

বিউটিসিয়ান শালিনীর কথায়— '২০০১-এ বিয়ে হলেও পরস্পর সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। অনেকবার একত্র থেকেছি, আবার আলাদা হয়েছি। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করাতে শাশুড়ির ভূমিকা ছিল, আধুনিক মনোভাব ও পরম্পরাগত মানসিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। অনেক বোঝানোর পরও জমল না। সাতবছর পর্যন্ত আমিই মানিয়ে চলেছিলাম। তারপর মহিলা বিভাগে যেতে হলো। ওখান থেকে (তালাক) বিচ্ছেদ পাওয়া গেল। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে শ্বশুরবাড়ি থেকে দু'লাখ টাকা পেলাম। এখন আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাই। কেননা আমার দুই ছোট শিশুপুত্র বাবার স্নেহ পেতে চায়। আর সমাজে সসম্মানে জীবনযাপনের জন্য সুরক্ষিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিবাহ-বিচ্ছিন্নার জীবন অতিবাহিত করছে শালু। তার মনের ব্যথা তার কথায়— ''আমার ভাবী স্বামীকে প্রথমবার দেখেই আমার ভালো লাগেনি। আমি শিক্ষিত আর ও অশিক্ষিত। শাশুড়ি আলাদা করে দেওয়ার পর ও জীবনযাপনের ব্যয় বা দায়িত্ব নির্বাহ করতে পারছিল না। তারপর সালিশি সভার মাধ্যমে আলাদা, পৃথক হয়ে গেলাম। এখন নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে চাই। তারপরই বিয়ের কথা ভাবব।''

৪৩ বছরের রচনা এক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকা। ১৯৮৪-তে তার বিয়ে হয়েছিল। পণের দাবির কারণে শ্বশুরবাড়িতে টিকতে পারছিল না। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রায়ই মারপিট করার মতো অমানবিক ঘটনা। একদিন সে মায়ের কাছে ফিরে এল। ১৯৯৯-এ তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয়। তখন রচনার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। আদালতে মামলা চলছে। এখনও ফয়সালা হয়নি।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় ওকালতি করা উকিল কুসুম রোহেলার কথায়— এখনকার শিক্ষিত মেয়েরা চাকরি-বাকরির সুবাদে অনেকটা সময় ঘরের বাইরে কাটায়। যদি কোনও পারম্পরিক ঐতিহ্যের পরিবারে তাদের বিয়ে হয়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। মেয়ে প্রায় স্বাধীন থাকতে চায় যা পরিবারের অন্যরা মেনে নিতে পারে না। এরকম অনেক মামলা আদালতে আসে। দু'পক্ষই বিচ্ছেদের আর্জি পেশ করে।

দিল্লী হাইকোর্টের উকিল বিবেকানন্দ ঝা আদালতে এরকম বিবাহ- বিচ্ছেদের অনেক মামলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাঁর মতে সহনশীলতা কম হওয়ার জন্যই বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। ওঁর আরও বক্তব্য মা-বাবা ছেলেমেয়েদের সঠিক পথনির্দেশ করতে পারছেন না। এর ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা বাড়ছে। এটাই পরবর্তী সময়ে অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ ব্যাসনবদন শাস্ত্রীর মতে—যদি প্রথম থেকেই পারিবারিক সুসংস্কার দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে সংস্কারিত করা যায় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা কমতে পারে।

হাস্যোজ্জ্বল শিশুকন্যা কি কেবলই ছবি ?

প্রীতি বসু

আজ ১৪ নভেম্বর— শিশুদিবস। চারদিকেই শিশুদের নিয়ে নানান আনন্দ-অনুষ্ঠান। তার মধ্যেই বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে— গোছা গোছা ফুল হাতে হাস্যোজ্জ্বল শিশুকন্যা।

কিন্তু দৈনন্দিন চিত্র হচ্ছে— কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সমাজের বিষদৃষ্টির সামনে দুঃখিনী মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর শিশুকন্যা বা কন্যাভ্রূণকে হত্যা করে ফেলবার জন্য, নিজে ধর্ষিত হবার জন্য বা শিশুকন্যার ধর্ষণ দেখবার জন্য অথবা নারী হবার দায়ে নানানভাবে অত্যাচারিত হবার জন্য।

স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় নারী সুরক্ষায় নানান রকম ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ১৯৭৫ এবং নারী দশক '৭৫-৮৫-এ ভারত সরকার দেশের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। এই সময়ে নারী উন্নয়নে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। সমাজে নারীর পুনর্মূল্যায়ন, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, নারী উন্নয়নের বিকল্প পথ, নারীর সমানাধিকার, উন্নয়নের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ এবং সমাজে মহিলাদের সমস্যা ও কী ধরনের চাহিদা থাকতে পারে সেসব প্রত্যেকটি বিষয়ে সরকার থেকে কর্ম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ফলত নারীর উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম এক বিশেষ জাতীয় কর্ম প্রক্রিয়াও গৃহীত হয়। এই কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল প্রথমত, জাতীয় কমিটি গঠন। দ্বিতীয়ত, জাতীয় কমিটির সঞ্চালক কমিটি নির্ধারণ। তৃতীয়ত, আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি গঠন এবং চতুর্থত, সমাজকল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত একটি মহিলা কল্যাণ উন্নয়ন ব্যুরো গঠন।

মহিলাদের উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত নানান ব্যবস্থাপনা হয়। নানানরকম কমিটি গঠিত হয়। আসল ফলাফলে মহিলাদের প্রকৃত উন্নয়ন কিছুই ঘটেনি। অত্যাচারের চরিত্র হয়তো বদল হয়েছে, কিন্তু চিত্র বদলায়নি। তাই তো দৈনন্দিন খবরে দেখা যায়, নারী ও শিশুকন্যাদের নানান রকম নির্যাতনের বিবরণ। খবর পাওয়া যায়— যা দারিদ্র ও সংসারের গঞ্জনার ভয়ে তৃতীয় কন্যার জন্ম দিয়েই তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। আবার সচ্ছল পরিবারে মাতৃগর্ভে থাকাতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করা হয় এবং ভ্রূণটি কন্যার হলে সঙ্গে সঙ্গে গর্ভমোচন করা হয়। এভাবে গর্ভমোচন যদিও বেআইনি, তবুও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈধভাবে কাজটি অহরহ-ই হয়ে চলেছে। 'মেডিকেল টারমিনেশান অব প্রেগন্যান্সি' আইনের কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের শরীর রক্ষার অধিকারকে সুরক্ষিত করতে গর্ভপাত করার— এই আইনেরই অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করা হয়।

সব থেকে মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে— গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই বিগতকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীরা একপক্ষ বিচার করে নিজ স্ত্রীকেই আবার কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য দায়ী করে তার উপর অত্যাচার করে অথবা তাকে সংসার থেকে বিতাড়িত করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে সকল শিশুকন্যা তথা নারী সমান সুযোগ পাচ্ছে, তা নয়। কিছু সংখ্যক পেলেও, বেশিরভাগ কিশোরীকেই কর্মরতা মায়েদের সংসার সামাল দিতে ও ছোট ছোট ভাইবোনেদের দেখাশোনা করতে নিজেদের লেখাপড়াকে শিকেয় তুলে দিতে হচ্ছে।

আর কর্মরতা মহিলারাও যে সবক্ষেত্রে পুরুষদের সমান বেতন পাচ্ছেন বা সকল রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা নয়।

মেয়েদের কম বয়সে বিয়েও এক বড় সমস্যা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক দুরবস্থা প্রভৃতি কুফল সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতা ও কুসংস্কারের কারণেই কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে চলেছে। মুসলমান সমাজে মহিলাদের অবস্থা আরও বেশী খারাপ। পণপ্রথা এখন সব ধর্ম ও সর্বস্তরে এক বিশাল সমস্যা হয়ে রয়েছে। এর পরিণতিতে বধূহত্যা বা বধূর আত্মহত্যা আকছার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারে নারীর প্রতি বৈষম্য, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি যেকোনও ক্ষেত্রেই মহিলারা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত হন বিধবারা। রাজ্যের বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির ক্ষেত্রে বিধবারা খাওয়া পরা, মান-মর্যাদা প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই' বৈষম্যের শিকার। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা প্রভৃতি অত্যাচার থেকে বৃদ্ধারাও রেহাই পাচ্ছেন না।

আবার দেশের যে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন হয়, তার মধ্যে যেগুলি গড়ে ওঠে উচ্ছেদের উপর। উচ্ছেদেরও দায়-ভার বেশীর ভাগটাই মহিলাদের বহন করতে হয়। যে সকল স্থানে উচ্ছেদ হয়, সে সকল স্থানের শিশুকন্যা ও কিশোরীদের জীবনযাত্রা পড়াশুনো সকলই বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। উচ্ছেদ-অঞ্চলের মহিলারা সাধারণত বাসনমাজা, রান্না বা আয়ার কাজ করেন। উচ্ছেদ হবার ফলে তাঁদের নিজ নিজ ঘর গৃহস্থালি যেমন এলোমেলো হয়ে যায়। তেমনি বাইরে যে কাজ করেন সেগুলিও ঠিকমতো করে উঠতে পারেন না। ফলে তাঁদের রুজি-রোজগারেও টান পড়ে। ফলে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনটুকুও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাইতো বলি, হাস্যোজ্জ্বল শিশুকন্যার ছবি, শুধুই ছবি।

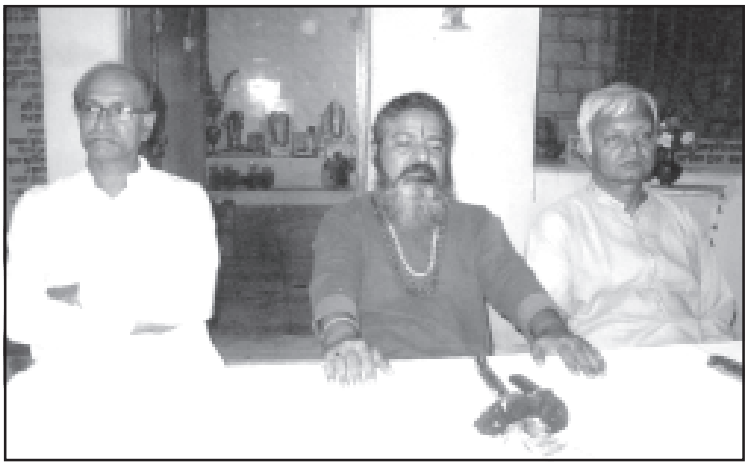

স্বস্তিকা গ্রাহকদের বিজয়া-দীপাবলী সম্মেলন

গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার বৃজিপাটুলিতে শিবকালী-নবগ্রহ মন্দির প্রাঙ্গণে স্বস্তিকার স্থানীয় গ্রাহকদের নিয়ে বিজয়া-দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ভারতমাতার ছবিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, সমবেত শঙ্খধ্বনি, ওঙ্কারধ্বনি, ভারতমাতার জয়ধ্বনি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভাপতি ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রী আচার্য শঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ শক্তিশেখর দাস।

স্বস্তিকা এখন যে নবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করেও তাকে সুন্দরতর ও আরও আকর্ষক কি করে করা যায় তার জন্য পাঠকদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং নানারকম প্রস্তাব আসে যা পরে স্বস্তিকা অফিসে পাঠানো হয়। কেউ কেউ এই সাপ্তাহিকের একটি দৈনিক সংস্করণেরও প্রস্তাব দেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডঃ তাপস দত্ত মাইকেল মধুসূদনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, স্বস্তিকা হলো আয়নার মতো, যার মাধ্যমে আমরা অনেক জ্ঞাতব্য বস্তু পরিষ্কারভাবে সামনে দেখতে পাই, যার জন্য দশটা বই ঘাঁটতে হয় না।

প্রধান বক্তা শক্তিশেখর দাস তাঁর ভাষণে অজস্র উদাহরণ দিয়ে সাংবাদিকতার জগতে স্বস্তিকার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেন যে গত বছর দেগঙ্গায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও পরিণামে দুর্গাপূজা বন্ধ হওয়ার খবর অন্য কাগজগুলি স্পষ্টভাবে বলেনি, কিন্তু একমাত্র স্বস্তিকা ছবিসহ যে খবর ছেপেছিল। কারণ স্বস্তিকা চাটুকার সংবাদপত্রগুলির মতো জনগণকে অন্ধকারে রাখতে চায় না। অনুষ্ঠানের সভাপতি তাঁর ভাষণে শিল্পের নামে আজকাল যেভাবে দুর্গাপ্রতিমা বিকৃতভাবে তৈরি করা হচ্ছে এবং দুর্গাপূজাকে 'শারদোৎসব' বলে চালানোর অপচেষ্টা এবং এভাবে সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ ধ্বংস করার যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করার কথা বলেন।

কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শেষে, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা ভারতীর সভাপতি সীতেশ ভট্টাচার্য সহ মোট ৬০ জন গ্রাহক ও পাঠক উপস্থিত ছিলেন।

মদনপুরে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ২৩ অক্টোবর রবিবার বিকালে নদীয়া জেলার মদনপুর সঙ্ঘ- পরিবারের শুভ বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে স্থানীয় দাদাভাই ভবনে স্বস্তিকা-র পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রধান অতিথি হিসাবে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক বিজয় কুমার আঢ্য সময়োচিত নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে জাতীয় চেতনা জাগরণে স্বস্তিকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সকলকে পত্রিকাটির গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানান।

সভার প্রারম্ভে বিশ্বনাথ দে, মহকুমা সঙ্ঘচালক হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ, রহড়া মিশন বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষক অনু বর্মনকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গুরুপদ চন্দ রামধেনু সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী রচিত 'ভারতবন্দনা' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান।

শংকর কুমার কর্মকার তাঁর বাড়ি সংলগ্ন ব্যবসা কেন্দ্রে সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ দে।

হালিশহরে কলেজ ছাত্র সম্মেলন

গত ২৩ অক্টোবর উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর মহকুমার হালিশহরে কলেজ ছাত্র-সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভারতমাতার পদকমলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে

উদ্বোধন করেন সম্মেলনের সভাপতি তথা আর এস এসের হালিশহর নগর সেবা প্রমুখ গৌরসুন্দর দে। প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ কাজল শিকদার। এরপর Right to Information-এর উপর বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তরের কার্যক্রমে অংশ নেন ড. জিষ্ণু বসু, অধ্যাপক সুপ্রতীক চক্রবর্তী এবং ৬০ জন ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যানেজমেন্ট ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। সমারোপ ভাষণ দেন আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীকান্ত নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ মদন বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডল। ৬০ জন কলেজ ছাত্র ও ২০ জন কার্যকর্তা সহ মোট ৮০ জনের উপস্থিতিতে গৈরিক ধ্বজের সামনে প্রার্থনার পর সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

হুগলী ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের সেবা কাজ

হুগলী ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ইনছুড়া রায়সাহেব হারাধন চন্দ্র আদিবাসী বিদ্যামন্দিরে গঙ্গাধরপুর গ্রামের কুমার পরিবারের দিবাকর কুমার এবং শ্যামসুন্দর কুমারের স্মরণে দুইদিন ব্যাপী বিনাব্যয়ে চিকিৎসা সম্পর্কিত সেবা কাজ অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের পূজ্যপাদ স্বামী তিতিক্ষানন্দ মহারাজ।

প্রথমদিন অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর শনিবার চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে রোটারী নারায়ণ নেত্রালয়ের সহায়তায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন বয়সের মোট ১৭৩ জন পুরুষ ও মহিলার চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ১৫ জন দুঃস্থ রোগীর বিনাব্যয়ে ছানি অপারেশন করা হবে বলে স্থির হয়। এছাড়া এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের অন্যতম সহযোগী বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পক্ষ থেকে অত্যল্প মূল্যে (১০ টাকা) চশমা দেবার অঙ্গীকার করা হয়।

শিবিরের বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অসীম মাঝি। শ্রী মাঝি তাঁর ভাষণে এই ধরনের সেবামূলক কাজের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন— সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি সেবমূলক উদ্যোগ সমানভাবে জরুরী এবং পরিপূরকও বটে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর সঙ্গম (সেবাপ্রতিষ্ঠান) শ্রীরামপুর-এর সহায়তায় ডাঃ শংকর

দাস-এর নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম ৯৯ জন মহিলা এবং পুরুষের হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্য রক্তচাপ, ই সি জি ইত্যাদি পরীক্ষা করেন। এছাড়া ৮৬ জন মহিলা এবং পুরুষের ডায়বেটিস রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং পরামর্শ দেওয়া হয়। এইদিন স্থানীয় সাংসদ ডাঃ রত্না দে (নাগ) শিবিরে উপস্থিত হুগলী ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘ সহ অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। জয়দেব নাগ (নাড়ুদা), বাসুদেব ঘোষ, তপন গাঙ্গুলী, তপন নাগ সহ বহু সমাজসেবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্যামল বসু, ভাস্কর ভট্টাচার্য, তারক সাহা, তপন মুখার্জী, সুশীল ভট্টাচার্য, উত্তম দাস, অমিতাভ দত্ত সহ বহু নিঃস্বার্থ ব্যক্তির নিরলস পরিশ্রম এবং সুদক্ষ পরিচালনায় এই সেবা কাজ সুসম্পন্ন হয়।

দেশজুড়ে গো-রক্ষার দাবিতে আন্দোলন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে কলকাতা টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম হজরত এস এস নরুর রহমান গো-হত্যার ব্যাপারে যেভাবে সরব হয়েছেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় গো-সেনার অধ্যক্ষ শ্রী আশু মোঙ্গিয়া। গত ৩১ অক্টোবর কলকাতা প্রেসক্লাবে তিনি আরও বলেন, নরুর রহমানের ঔদ্ধত্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় পাঁচবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি রাজি হননি, তাঁর দপ্তর থেকে নাকি বলা হয়েছে গো-হত্যার ব্যাপারে তিনি কথা বলতে নারাজ। আগামীদিনে শুধু রাজ্য নয়, দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা সেনা আন্দোলনে সামিল হবেন বলে শ্রী মোঙ্গিয়া জানান।

বিজয়া সম্মেলন

সংস্কৃত ভারতী কলকাতা

'সংস্কৃত ভারতী'র কলকাতা শাখা আয়োজিত বিজয়া সম্মেলন গত ২২ অক্টোবর সুরোজ্জ্বলা চতুষ্পাঠীতে (পিয়ারলেস হাসপাতালের নিকট) অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী অমর মজুমদার। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অজিত ভদ্র ও পৃথ্বীশ পত্রনবীশ। সকল বক্তাই সংস্কৃত ভাষায় বিজয়া সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। চাঁপাডাঙা মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান তথা সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কাশীনাথ নন্দী সংস্কৃত ভারতীর কাজের ক্রমবিকাশ-এর বিবরণ তুলে ধরেন তাঁর সুললিত বক্তব্যের মাধ্যমে। জে. বি. রায় আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডাঃ স্নেহলতা নস্কর সংস্কৃত ভারতীর মাধ্যমে সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটির আলোচনা-সভা

ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের স্বার্থেই সরকারের নতুন চিন্তাভাবনা করা উচিত অথচ কেউই তা করছে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন হরলালকার মতো কলকাতার একশ্রেণীর স্বনামধন্য ব্যবসায়ীরা। গত ২৩ অক্টোবর মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ অনুষ্ঠিত লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটির আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ীরা এই মন্তব্য করেন।

সংস্কার ভারতী মালদা

অপর একটি বিজয়া সম্মেলন গত ২১ অক্টোবর সংস্কার ভারতীর মালদা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে পালিত হলো 'শুভ বিজয়া ও দীপাবলী'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মা দুর্গা ও নটরাজ মূর্তিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট নাগরিক সঞ্চিত ঘোষ। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক দীনেশ বসাক, প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী বিনয় রায় এবং সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি দীনেশ দে প্রমুখ।

শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি

কলকাতার ভবানীপুর থানার বিপরীতে জাতীয় সড়কের (৪১নং) ধারে সরস্বতী শিশুমন্দির বিদ্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্যগণ শুভ বিজয়ার প্রীতি বিনিময়ের এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমলেশ জানা। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জয়নগর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ দাস।

পরলোকে সুশান্ত কুমার মাইতি

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মেদিনীপুর জেলা-সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশান্ত কুমার মাইতি গত ১২ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। কর্মজীবনে তিনি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জজ কোর্টের বিচারক ছিলেন। ধর্মানুরাগী সুশান্তবাবু অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রথম বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আজীবন সদস্য হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।

কোচ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হোক

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

একশো পঁচিশ বছর বয়স হতে চলল মোহনবাগানের। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও ক্লাবের সুনাম সুবিদিত। এবার বোধহয় সেই সুনামকে আর ধরে রাখা যাবে না। ক্লাবকর্তারা দায়িত্ব নিয়ে শতাব্দী প্রাচীন জাতীয় ক্লাবটিকে জনমানস থেকে মুছে ফেলতে চান। মোহনবাগান জনতা যদি এখনও তাদের প্রাণাধিক প্রিয় ক্লাবটিকে বাঁচাতে এগিয়ে না আসে, তাহলে মহামেডানের মতো অবস্থা হবে অচিরেই। কোচ স্টিভ ডার্বিকে যেভাবে অপমান করে সরিয়ে দেওয়া হলো, তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই চরম অবমাননাকর। এই টুটু বসু, অঞ্জন মিত্ররা অতীতে মামলা-মোকদ্দমা করে ঐতিহ্যশালী মোহনবাগানকে আদালত চত্বরে টেনে নিয়ে গেছেন। অনেক কাটাছেঁড়া হয়েছে আদালতে, যা দেখে বহু প্রবীণ মোহনবাগানী নীরবে চোখের জল ফেলেছেন আর ক্লাবে আসাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

যে ক্লাবের প্রশাসনে ছিলেন বলাই দাস চ্যাটার্জি, উমাপতি কুমার, করুণা ভট্টাচার্য, সর্বোপরি ধীরেন দের ব্যক্তিত্ব, সেই ক্লাবের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন বেনিয়া টুটু বসু আর তার সাগরেদ অঞ্জন মিত্র। আর চালিয়ে যাচ্ছেন বিরামহীন স্বেচ্ছাচার যা দেখেও চুপ করে বসে আছেন দেশে-বিদেশে কোটি কোটি মোহনবাগান সমর্থক। খেলোয়াড়, কোচ প্রত্যেককে এঁরা ক্রীতদাস মনে করেন। যে সুব্রত ভট্টাচার্য আজীবন মোহনবাগানী তাঁকে এঁরা অপমান করে ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন আবার এখন তাঁকেই জামাই আদর করে ডেকে নিয়ে এসেছেন। ফেডারেশন কাপে বিধ্বস্ত মোহনবাগানের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর করে আনা হয়েছে সুব্রতকে। আর কোচ হিসেবে প্রশান্ত ব্যানার্জিকে। কোচ-টিভির মাথার ওপরে রাখা হয়েছে চুনী গোস্বামী, প্রদীপ চৌধুরি, সত্যজিৎ চ্যাটার্জিকে নিয়ে গড়া তিন সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি। তবে কাউকেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। ওই টুটু অঞ্জন আর দেবাশিস দত্ত— এই ত্রিমূর্তি যা বলবে যা ভাববে তাই হবে।

গত কয়েক বছরে এঁরা কোনও কোচকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেননি। অমল দত্তের মতো বিচক্ষণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোচকে চরম অপমান করে তাড়িয়েছেন। একই দশা হয়েছে 'দ্রোণাচার্য' সৈয়দ নঈমুদ্দিনের ক্ষেত্রেও। চাটুনি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, অলোক মুখার্জি, কার্লোস আলবার্তো পেরিস, স্টিভ ডার্বি, চিমা, সুভাষ, হাবিব— সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। কাউকে থিতু হতে দেননি। চটজলদি কাপের আশায়

সুব্রত ভট্টাচার্য

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি ম্যাচে ব্যর্থ হলেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। অথচ টিমের ফিজিক্যাল কন্ডিশনিং রি-হ্যাব ট্রেনিং যে ঠিকমতো হয় সেদিকে নজর নেই তাঁদের। এই ব্যাপারগুলো ঠিক থাকলে কোচ ও ট্রেনার খোলামনে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দল সাজাতে পারেন। গোয়া, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবের বড় ক্লাবগুলিতে যেসব সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় তা কেন করতে পারেন না মোহনবাগান কর্তারা। এমনকি প্রতিবেশী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও একই মালিকানাধীন হয়ে ক্লাবে জাকুঁজি, মাল্টি জিম, রি-হ্যাব ক্লিনিক করে খেলতে পারে। অথচ ইউবি গ্রুপের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে এবং অন্যান্য স্পনসরদের দাক্ষিণ্য পেয়ে মান্ধাতার ব্যবস্থা নিয়ে ক্লাব চালাচ্ছেন এঁরা।

ইস্টবেঙ্গল বা অন্যসব বড় দল কোচকে সময় দেয়। অন্তত ২/৩টি টুর্নামেন্ট দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়। কোচকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় তো দিতে হবে। নিয়মিত একাদশ ও রিজার্ভ বেঞ্চকে তৈরি রাখার জন্য যা করণীয় তার জন্য মোটামুটি একটা পরিকাঠামো থাকা দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার স্বাধীনভাবে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ। সেই খোলামেলা পরিবেশটাই যে নেই। ইস্টবেঙ্গলে কোচের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় না। কোচ-খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের বাতাবরণ আছে বলেই ইস্টবেঙ্গল জাতীয় পর্যায়ে মোটামুটি সফল। ইদানিংকালে তিনবার ফেডারেশন কাপ জিতেছে। গত জাতীয় লিগে রানার্স, একটুর জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। আর যে সালগাঁওকরের পিছনে থেকে জাতীয় লিগ শেষ করেছিল তাদেরকেই হারিয়েই সুপারকাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। আর সেখানে মোহনবাগান কোথায়? একসময় তো জাতীয় লিগে অবনমনের সামনে চলে এসেছিল তিনবারের জয়ীরা। অথচ খেলোয়াড় কোচকে নিয়ে টানাপোড়েন, প্রশাসনিক ডামাডোল অব্যাহত। ক্লাবের ভাল যে কর্তারা চান না।

আই এফ এ শিল্ড জয়ের শতবর্ষ কিরকম সাদামাটাভাবে পালন করল মোহনবাগান কর্তারা! এতবড় একটা ঘটনা, তা নিয়ে যে রকম উৎসাহ- উদ্দীপনার জোয়ারে ভেসে যাওয়ার কথা ফুটবলপ্রেমী বাঙালির তা বাস্তবায়িত হলো না কর্তাদের ব্যর্থতায়। অথচ তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষ নিজের সীমিত ক্ষমতায় মোটামুটি মনে রাখার মতো একটা শো-পিস উপহার দিয়েছেন। টুটু-অঞ্জনরা যে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতীয় ক্লাবে এসেছেন। ক্লাবকে জাতিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে তোলার কোনও সদিচ্ছেই নেই। নামকাওয়াস্তে জলপাইগুড়ি, দুর্গাপুরে দুটো অ্যাকাদেমি চালাচ্ছেন, যা থেকে কোনও ভাল ফুটবলারও উঠে আসছে না। ইস্টবেঙ্গল যেমন মাঝে মধ্যেই বিদেশে খেলতে যায়, মোহনবাগান সেখানে আটকে ঘরোয়া ফুটবলের চৌহদ্দির মধ্যে। এরকম অজস্র উদাহরণ দিয়ে বলা যায় মোহনবাগানের যাবতীয় ঐতিহ্য, গৌরবগরিমার অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটটি। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকে ক্লাবে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ তাঁদের পরামর্শ কানে নেন না কর্তারা। এভাবে ক্লাব প্রশাসন চললে দেশের ক্রীড়া সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত মোহনবাগান 'এল-ডোরাডো হয়ে যাবে।

শব্দরূপ-৬০১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

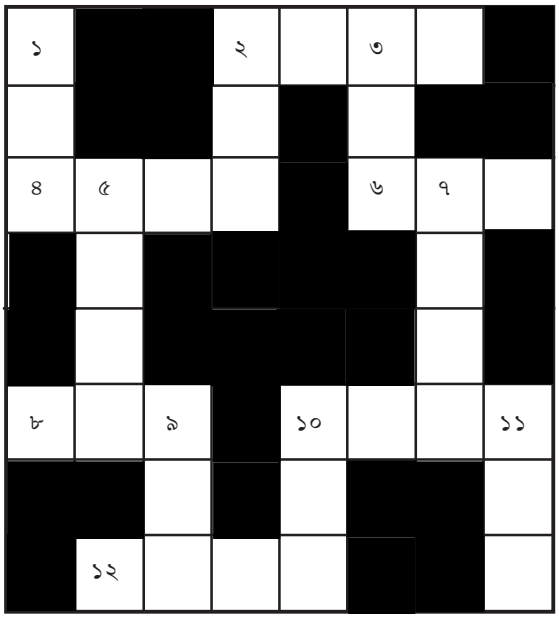

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. বেদান্তের ব্রহ্মের বদলে শূন্যকেই যে মতবাদে উৎপত্তি ও বিলয়ের নিদান ধরা হয়, বৌদ্ধদের মতবাদ, ৪. ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা, মুনিবিশেষ, ৬. বৃহৎ ভারবাহী নৌকাবিশেষ, ৮. এই কাণ্ডের জেরে ২০০২-এ গুজরাটে দাঙ্গা বেঁধেছিল, ১০. ব্রাহ্মণ বালক, ছেলেমানুষ, ১২. গণেশ।

উপর-নীচ : ১. বন, অরণ্য, ২. 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা কবি, ৩. দেবরাজ, ইন্দ্র, ৫. গর্ভবতীকে সাতমাসে প্রদেয় বহুপ্রকার তাজা শস্যাদি, ৭. 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি, ৯. এর চিতার আগুন কখনও নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না, ১০. পবননন্দন, হনুমান, ১১. কয়েতবেল (বানরের প্রিয়)।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	ব	■	ধ	■	ই	ক্ষ্মা	কু
■	সু	ধ	র্মা	■	ন্দি	■	ব
রা	■	■	স	ম্ব	রা	■	ল
ব	র্ধ	মা	ন	■	■	■	য়া
ণে	■	■	■	স	না	ত	ন
র	■	ব	রা	হ	■	■	ন্দ
চি	■	ল্ল	■	জি	ব	ন	■
তা	গু	ব	■	য়া	■	ক্ত	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

হিন্দুদের আবাদী জমির ওপর সূতিতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস

তরুণ কুমার পণ্ডিত

যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক সময়ে দেশভাগের চক্রান্ত হয়েছিল, তারই একটি ক্যাম্পাস বা কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সূতি-১নং ব্লকের আহিরণ অঞ্চলে গত বছর শিলান্যাস করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, এই খবর আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু হিন্দুদের আবাদী জমির উপর তিনটি সম্পূর্ণ হিন্দু গ্রামের মধ্যে এই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে এই খবর অনেকেই জানেন না। যদিও এই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস শিলান্যাসের দিন আহিরণ অঞ্চলের রসুনপুর, জলঙ্গাপাড়া ও বাঙ্গাবাড়ি গ্রামের অধিবাসীরা কেউ সেই অনুষ্ঠানে যাননি এবং তারা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বিরোধী মঞ্চ তৈরি করে এর বিরোধিতা করেছিল, অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। বহরমপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে আহিরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকাতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে যথারীতি ফসল লাগানো রয়েছে। ক্যাম্পাস বিরোধী মঞ্চের সভাপতি জগদীশ দাস বললেন, আমাদের তিনটি হিন্দু গ্রামের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ২০০ একর জমি কিনেছেন ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য। সে সময়ে এবং তার পরেও ওই জমি ব্যারেজের কোনও কাজে না লাগায় তারা জমির দখলও নেয়নি। ফলে ওই জমিতেই বসবাস করে আসছেন তিন গ্রামের ২ হাজার ৪৬৯টি পরিবার। ১৯৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দফতরে গ্রামবাসীদের জমি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাঁধ কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার ইউ এন বালা জেলাশাসককে জানিয়েছিলেন, বাঁধ প্রকল্পের কোনও কাজে না লাগায় ওই উদ্বৃত্ত জমি সরকারি মূল্যের বিনিময়ে গ্রামবাসীদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। ফেরত দেওয়ার জন্য যে order, তার কপি আছে কিন্তু তৎকালীন জেলা শাসক এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেননি। ফলে আইন অনুসারে আজও তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। এখন মঞ্চের সম্পাদক মদনমোহন ঘোষ এবং স্বাধীন ঘোষ, বাদল দাস, নারায়ণ চন্দ্র দাসরা জানিয়েছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদিত জায়গার মধ্যে তিনটি গ্রামের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ একর জমি পড়েছে। আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম ওই জমি বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ার জন্য। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি ফলে, আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। বিজেপি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা মহকুমা শাসকের কাছে গ্রামবাসীদের পক্ষ হয়ে ডেপুটেশন

দিয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, উচ্চ আদালতের নির্দেশ রয়েছে যে ওই দুশো' একর জমিতে কোনও নির্মাণ করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। (কেস নং W.B. 3276-2009) অথচ কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে তিন ফসলি আবাদী জমি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিলেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসীরা শেষ ডেপুটেশন দিয়ে চাষীদের জীবন জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে এবং ২৪৬৯ পরিবারের স্থায়ী সু-বন্দোবস্তভাবে বসবাস করার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। গ্রামবাসীরা প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ, কপিল সিব্বাল, অরুণ জেটলীর নিকট উচ্চ-আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির বিপক্ষে গণস্বাক্ষর দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানালেন, বাংলাদেশ থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরি হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলা শুধু মুসলমান অধ্যুষিত নয় সূতি-১ নং ব্লকের অন্তর্গত এখানকার বি ডি ও, পঞ্চায়েত সভাপতি, মহকুমা শাসক, থানার ওসি এবং ডি এম সংখ্যালঘু মুসলমান হওয়ায় গ্রামবাসী হিন্দুদের দাবি কতটা পূরণ হবে, সন্দেহ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালন সমিতির সদস্য মুর্শিদাবাদের সাংসদ মাইনুল হাসান বলেছেন, সূতি আহিরণের তিনটি গ্রামের বাসিন্দারা যা বলছেন, তা ঠিক নয়, মিথ্যা, এখানে তাঁদের কোনও জায়গা নেই। এখানে তাঁরা উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সূতি থানার ও সি সাধু খাঁ কে মুসলমান দুষ্কৃতীরা সম্প্রতি বোমা মেরে তাঁর একটি হাত উড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাঁর জায়গাতে মুসলমান ও সি জামাল শেখ এসেছেন। তাছাড়া ২০০৯ সালে রাজ্য গোয়েন্দা দফতর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরকে জানিয়েছিল যে, মুর্শিদাবাদ ও মালদার সংখ্যালঘু অঞ্চল নিয়ে মৌলবাদী সংগঠন বাংলাদেশী মৌলবাদী সংগঠনের সহায়তায় দুই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে গোপনে কাজ করে চলেছে। সুতরাং এই মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যে সেই মৌলবাদীদেরই হাত শক্ত করবে না এবং জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়াবে না—তার গ্যারান্টি কোথায়?